ঈমান জাগানিয়া কাহিনী

মাওলানা তারিক জামীল

www.muhammadsaifurbd.wordpress.com

সুন্দরী যুবতীর প্রশ্ন?

কোন এক যুদ্ধে হাবীব ইবনে উমায়ের নামক এক সাহাবী রোমানদের হাতে বন্দী হলেন। রোমান বাদশাহ তাকে বলল, তুমি যদি স্বধর্ম পরিত্যাগ কর আর যদি খৃষ্টান হয়ে যাও তাহলে আমার পরমা সুন্দরী কন্যার সাথে তোমার বিবাহ দেব এবং অর্ধেক রাজত্ব তোমাকে দিয়ে দেব। উমায়ের বললেন, তুমি যদি সমস্ত দুনিয়াও দিয়ে দাও তবুও এটা অসম্ভব। বাদশাহ তখন নিজের সুন্দরী কন্যা আর বন্দী সাহাবীকে নির্জন এক কক্ষে বন্ধ করে রাখল। মেয়েকে বলল, যেভাবেই হোক তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত কর, তাহলে অন্যসব কাজ সহজ হয়ে যাবে। তিন দিন তিন রাত সে মেয়ে নিজের যৌবন আর সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বন্দী সাহাবীকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতে থাকল। কিন্তু এ তিন দিনে এ সাহাবী এক মুহূর্তের জন্যও চোখ তুলে তার দিকে দেখলেন না যে, আমার সামনে কে।

এটা কিভাবে সম্ভব হল? হ্যাঁ, তারবিয়তের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমাদের যেহেতু সেভাবে তারবিয়ত করা হয়নি, আল্লাহ্‌র হুকুম মানার জন্য এভাবে অনুশীলন হয় নি। তাই আমাদের দৃষ্টিকোণ বাধা মানে না, নত হতে জানে না, শুধু উপরে উঠে যায়। কিন্তু তাঁরা শিখেছিলেন, তাই একদিকে রোমের বিশ্ব সুন্দরী যুবতী আর অপর দিকে আরবের মরুভূমির টগবগে দীপ্ত যৌবন, অন্য কেউ সেখানে নেই, তবুও হয়নি কোন স্খলন।

পাঠক লক্ষ্য করুন! আর এখানে তিনদিন তিনটি রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময়ের মধ্যে সাহাবী সে পরমা সুন্দরীর দিকে চোখই উঠালেন না, তখন গোমরাহ করার সুযোগ কোথায়? পরিশেষে রোমান কন্যা নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠল যে, একি রক্ত মাংসে গড়া মানুষ না গাছ-পাথর!!

তাবলীগ জামাতের জীবন্ত কিংবদন্তী মাওলানা তারিক জামিল বর্ণিত এ রকম ১৩২টি শিক্ষামূলক ঈমানী ঘটনার অসাধারণ সংকলন আমাদের এই—

ঈমানজাগানিয়া কাহিনী

www.muhammadsaifurbd.wordpress.com

অর্পণ

যাঁর পদতলে আমি জান্নাতের দরওয়াজা তালাশ করি, সেই দয়াময়ী 'মা' যাঁর স্পর্শের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এখনো আমার শরীরে লাগে – এমন স্পর্শ আল্লাহ্ আমার জন্য আরো দীর্ঘায়িত করুন।

আর 'বাবা'- সেতো কবে-ই দয়াময়ের করুণায় আলিঙ্গন করেছে তাঁর প্রতি আল্লাহ্ দয়ার আচরণ করুন। আমীন–

প্রকাশক

ঈমানজাগানিয়া কাহিনী

বর্ণনায়

মাওলানা তারিক জামীল

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা সুলাইমান ঢাকুবী

ইমাম ও খতীব, গনী মিয়ার হাট শাহী জামে মসজিদ, চকবাজার, ঢাকা

মুন্তাখাব প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দূরালাপনী : ০১৭৪৮-৯৭৪৯৫৩; ০১৬৮৭-৬০৯৪৯২

"মুন্তাখাব প্রকাশনী"-র
আরও কয়েকটি বই

- মুন্তাখাব হাদীস
  - মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী (রহ.)
- মহিলাদের বয়ান
  - মাওলানা তারিক জামীল
- বিষয়ভিত্তিক আকর্ষণীয় বয়ান
  - মাওলানা তারিক জামীল
- মুন্তাখাব হাদীসের আলোকে ছয় নম্বর
  - মাওলানা আবদুর রহমান
- নির্বাচিত বয়ান সমগ্র
  - মাওলানা তারিক জামীল
- তাজা ঈমানের ৫০০ গল্প

ঈমানজাগানিয়া কাহিনী

বর্ণনায় | মাওলানা তারিক জামীল

ভাষান্তর | মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

সম্পাদনায় | হাফেজ মাওলানা সুলাইমান ঢাকুবী

প্রকাশকাল | মে ২০১২ ঈসায়ী

প্রকাশক | মুন্তাখাব প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব | প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-984-8947-03-6

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

আমাদের কথা

ঈমান সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঈমান সতত মানবজাতিকে নেক আমলের দিকে ধাবিত করে, আর নেক আমল মানব সম্প্রদায়কে কুদরতী সত্তা মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্যের পর্দা পার করে নিয়ে যায় জান্নাতের অভ্যন্তরে। যেখানে চিরস্থায়ী সুখ-কখনো দুঃখের প্রলেপ নেই। সুতরাং যার ঈমান জাগ্রত সে দোজাহানের রাজা। কারণ সমস্ত রাজাদের রাজা-রাজাধিরাজ সত্তা, তার পবিত্র কালামে বলেন, যার ঈমান জাগ্রত আমলও চলন্ত সে আমার প্রেমাস্পদ আমার ভালবাসা আমার বন্ধু। (ভাবার্থ ঃ সূরা মারিয়াম-৯৬)

তাই মানব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির নেতৃত্ব দানকারী মনন সত্তা ও বিশ্বাসের বলয় থেকে গায়রুল্লার ইয়াকীন বের করে একক সত্তার পবিত্র ইয়াক্বীন প্রতিস্থাপন করে ঐ বলিষ্ঠ নির্মল ঈমান জাগ্রত করা প্রত্যেক মুহাম্মদী উম্মতের দায়িত্ব–যে ঈমান জাগ্রত হয়েছিল সাহাবাদের অন্তরে। সুতরাং এ দায়িত্ববোধ, কর্তব্যের সামান্য প্রয়াস হিসাবে বিকশিত হলো আমাদের এ **"ঈমানজাগানিয়া কাহিনী"** নামক গ্রন্থটির সংকলন। যা বিশ্ব তাবলীগের জীবন্ত কিংবদন্তী মাওলানা তারিক জামীল সাহেব-এর দুনিয়াব্যপী দাওয়াত ও তাবলীগের বয়ান, মুজাকারার আলোচ্য ঘটনাবলীর নির্বাচিত নির্যাস বা মজমুয়া এই **"ঈমানজাগানিয়া কাহিনী"** নামক দুর্লভ গ্রন্থ। আমাদের আশা-আকাংখা যে এ সংকলনটি সর্বস্তরের মানুষের অন্তরে ঈমান জাগ্রত করবে এবং সঠিক পথে উন্নীত করবে। কারণ কুরআন-হাদীসের ঘটনাবলী নবী আলাইহিমুস সালাম ও সাহাবা (রাযিঃ)-দের হৃদয়স্পর্শী কাহিনী-গুলোতে রয়েছে আমাদের ঈমান জাগ্রত হওয়ার উপকরণ। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ (হে আমার রাসূল!) আমি আপনার নিকট পূর্ববর্তী রাসূলদের বৃত্তান্ত এজন্য বর্ণনা করেছি যেন আপনার অন্তর (ঈমান দ্বারা) মজবুত হয়ে যায়। (ভাবার্থ ঃ সূরা ইউসুফ-১২০)

তাই নবী রাসূল সাহাবাদের মহাসত্য ঘটনাবলী নিয়ে সংকলিত হয়েছে মাওলানা তারিক জামীলের "ঈমানজাগানিয়া কাহিনী" যা আমাদের অন্তরে ঈমান জাগ্রত করবে ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে ভুলভ্রান্তির জন্য মহাপ্রভুর কাছে রইলো ক্ষমা প্রাপ্তির প্রত্যাশা এবং পাঠক-পাঠিকাদের নিকট রইলো শুধরে দেওয়ার তামান্না। আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করুন পরকালে মুক্তির জরিয়া বানান। আমীন!

—সুলাইমান ঢাকুবী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জনৈক বুযুর্গের ঘটনা	৯
জাগতিক জীবনে হযরত উমরের (রা.) চিন্তা-চেতনা	৯
নামাযে দাঁড়িয়েই জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন	১১
জান্নাতী হুর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে	১২
বাদশাহ হয়েও খাদ্য কষ্ট	১৩
দুনিয়ার মোয়ামেলা	১৩
দ্বীনী কাজে কোরবান এক ব্যক্তির কাহিনী	১৪
মক্কাবাসীর আত্মত্যাগ	১৪
জনৈক ইয়াহুদী সন্তানের ঈমান আনয়ন	১৬
কুদরতী সৈন্যবাহিনী	১৭
দুই সাপের সাক্ষ্য প্রদান	১৭
হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য দরিয়ার মধ্যখানে রাস্তা	১৭
বৈশিষ্ট্যসহ জান্নাতের বৃক্ষের বর্ণনা	১৮
ইয়েমেনের জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী	১৯
কুকুরের ওয়াফাদারীর একটি অনুপম কাহিনী	২০
জনৈক সাহাবী কর্তৃক আল্লাহ্র মহব্বতে মদ এবং সুন্দরী নারী পরিত্যাগ	২০
হাফেজে কুরআনের মর্যাদা	২১
ক্ষুধার তাড়না আমাকেও বাইরে আসতে বাধ্য করেছে	২২
আমি তাঁকে এক দিলে তিনি আমায় দশ দিবেন	২৩
হযরত আলী (রা.)-এর এখলাস	২৪
সাহাবায়ে কিরামদের (রা.) আত্মত্যাগের কাহিনী	২৪
আল্লাহ্ তায়ালার খাজানা অফুরন্ত	২৬
হযরত আলী (রা.)-এর নামাযে একাগ্রতা	২৭
আল্লাহ্ ভরসার সুফল	২৭
বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত হুদ (আ.) এর কওমের অবাধ্যতার পরিণাম	২৯
রাসূলের প্রেমে নিবেদিত প্রাণ	৩১
হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর মর্যাদা	৩১
জনৈক বেদুঈনের প্রতি নবীজীর উপদেশ	৩২
নবীজীর দুআয় মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত	৩৩
হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রহ.)-এর বিস্ময় কাহিনী	৩৪
নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতপ্রীতি	৩৫
বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্র কুদরতের নমুনা	৩৬
জনৈক বেদুঈনের তিনটি প্রশ্ন	৩৭
ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের কাহিনী	৩৮
এক শাহাদতপ্রাপ্ত সাহাবীর বীরত্বের কাহিনী	৩৮
তালুত ও জালুতের কাহিনী	৩৯
স্বামীর নির্দেশ পালনের প্রতিদান	৪০
জনৈক আনসারী সাহাবী ও তাঁর মায়ের কাহিনী	৪১
হযরত আযরাইল (আ.)-এর দয়া	৪১
এক লক্ষের পরিবর্তে পনের লক্ষ	৪২
খাঁটি তওবার একটি কাহিনী	৪৩
ঔষধে শেফা নেই, শেফা আল্লাহ্র হুকুমের মধ্যেই	৪৪
চোখের সৌন্দর্য এবং দৃষ্টি শক্তি বেড়ে গেল	৪৫
বাদশাহর খুশি বিষাদে পরিণত হল	৪৫
আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার পরিচয়	৪৬
কুস্তি লড়ে ঈমান আনয়ন	৪৭
এক হুর দেখে তিনমাস বেহুশ	৪৮
এক যুবকের অন্তরে সুন্নাতের মহব্বত	৪৯
বিষয়	পৃষ্ঠা
এক বেদুঈনের ঘটনা ও হযরত হুযাইফার সাক্ষ্য	৫০
হযরত আমর ইবনে জামুহ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী	৫১
আজ থেকে আমি তোমার পিতা আর আয়েশা তোমার মাতা	৫২
মাত্র এক রাতের বিবাহিতা জীবন-অতঃপর শহীদ	৫৩
আল্লাহ্ যার যামিনদার	৫৪
এক আরবী যুবকের আশ্চর্যজনক কাহিনী	৫৫
আজ চার দিন হচ্ছে এক লোকমা খানাও আমার পেটে পড়েনি	৫৬
বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্র মদদ	৫৭
আনসারদের রাসূলপ্রীতি	৫৯
হযরত শুরাহবীলের ঈমানী শক্তি	৬০
কওমে লূতের ধ্বংসের কারণ	৬১
মেসওয়াক করার দ্বারা কেল্লা জয়	৬১
তাঁরা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ আর আমরা এখন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন	৬২
রাসূলের দরবারে ফরিয়াদী উট	৬৩
মূসা নবীর জিজ্ঞাসা আমাদের শিক্ষা	৬৩
সুন্দরী নারীর প্রশ্ন তুমি মানুষ না পাথর?	৬৪
তাকবীরের এক হাঁকে এত শক্তি!	৬৫
মেহনতের প্রথম ফল পরিবর্তন	৬৫
আহ্! সেটা কেমন নামায ছিলো	৬৬
সারা দুনিয়ার উপর বাদশাহী করে এটাই হল আমার পরিণতি	৬৬
পশুরাও কথা বলে	৬৭
নবীর দোয়ায় সবই সম্ভব	৬৮
এতো খোশহালী জীবন আমার জন্য নয়	৬৯
নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে খোদায়ী নুসরত	৬৯
অন্তরে যার দ্বীনের মুহাব্বত সেই-ই তো হলো নবীর উম্মত	৭১
আল্লাহ্ তায়ালা যা চান তাই হয়	৭১
আযাব প্রেরণে কুদরতের ব্যবহার	৭২
বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্র নাফরমানীর পরিণতি	৭২
পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ কোনটি উত্তম? অবৈধ ধন-সম্পদ নাকি তাকওয়া!	৭২
আল্লাহ্কে যত দেয়া যায় ততই লাভ	৭৪
সারা জীবন গানের আসরে সর্ব শেষে কালিমা নিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে	৭৪
আল্লাহ্ কিভাবে মেনে নিবেন?	৭৫
নামাযে অমনোযোগিতা-চল্লিশ বছরের বিচ্ছেদ	৭৬
গোমরাহীর গর্ত থেকে হেদায়েতের উচ্চাসনে	৭৬
নবীপ্রেমের অনুপম দৃষ্টান্ত	৭৭
হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর বিবাহ প্রস্তাব	৭৮
দিলাম শুধু আটা ফেরত এলো গোশতসহ রুটি অপূর্ব প্রতিদান	৭৮
ত্রিশ দিরহামের বিনিময়ে তিনশত দীনার	৭৯
আল্লাহ্ তায়ালার লজ্জাবোধ	৮০
দুনিয়ামুখী মানুষের অবস্থা	৮১
দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী	৮২
এক সাথে হাসি-কান্নার রহস্য	৮৩
ফিরাউনের দাসীর ঈমানী শক্তি	৮৩
কিশোর জিলানীর সত্যবাদিতা	৮৫
যেমন মা তেমন ছেলে	৮৬
একেই বলে মুসলিম নারী	৮৮
সত্যিকার পিতার বৈশিষ্ট্য	৮৯
ছিল জেলে-বনে গেল বাদশাহ	৯০
বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সীমাহীন মেহেরবাণী	৯১
হযরত উসমান (রা.)-এর নামায	৯১
ন্যায়পরায়ন এক বাদশাহ	৯১
কোথায় গেলো এমন ক্রেতা ও বিক্রেতা?	৯৩
ছিল জাহান্নামী হয়ে গেল জান্নাতী	৯৪
যার কারণে বৃষ্টি বন্ধ, তাঁর কারণেই বৃষ্টি চালু	৯৪
এক নারীর কান্না আরশের দরজা খুলে দিয়েছে	৯৬

বিষয় ---------- পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র সাথে যার মহব্বত সে-ই সফল কাম ---------- ৯৮
রাজত্ব উনিশ বছরের আফসোস অনন্তকালের ---------- ৯৯
পিতা মাতার নাফরমানীর পরিণতি ---------- ১০০
অন্যায় থেকে বাঁচার কেমন আগ্রহই ছিলো ---------- ১০১
এটা বাদশাহী নয়, নবুওয়ত ---------- ১০১
মৃত্যুর মুখোমুখি-এরপরও নামায ছাড়েন নি ---------- ১০২
এক যুবকের যৌবন ধ্বংসের আশ্চর্য ঘটনা ---------- ১০২
নবীর প্রেমে মত্ত গাধা ---------- ১০২
কুরআন তেলাওয়াতের প্রভাব ---------- ১০৩
তাওবার আপ্রাণ চেষ্টা, অতঃপর জান্নাত গমন ---------- ১০৪
আবার সুদ হয়ে যায় কিনা! তাই তো তিনি রোদে দাঁড়িয়ে.... ---------- ১০৫
আইয়ূব আলাইহিস সালাম-এর ধৈর্যের প্রতিফল ---------- ১০৬
ঘরে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি ---------- ১০৭
কারুণের শাস্তি ---------- ১০৮
মা তোমার জন্য এ মর্যাদা-ই যথেষ্ট ---------- ১০৯

বিষয় ---------- পৃষ্ঠা
সুন্নাত অনুসরণের প্রতিদান ---------- ১১০
শিশুটি বলল-আমরা কি দুনিয়াতে খেলতে এসেছি? ---------- ১১১
রোমান মেয়ে। রূপের বাহার- ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা ---------- ১১২
তাওবা-ই নাজাতের পথ ---------- ১১৩
আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক রাতের পাহাড়ায় জান্নাত অবধারিত ---------- ১১৩
ঘোড়া নামিয়ে দেয়া আমাদের কাজ নদী পার করানো আল্লাহ্‌র কাজ ---------- ১১৪
কুরআন পাকের বৈশিষ্ট্য ---------- ১১৫
জাগতিক জীবনে এমন দৃষ্টান্ত বিরল ---------- ১১৬
এক কোটিপতি আরবের যিন্দেগী পরিবর্তন ---------- ১১৭
হারাম বর্জনে আল্লাহ্‌ তায়ালার খাজানা খুলে গেল ---------- ১১৯
একটি গল্প- আমাদের শিক্ষণীয় ---------- ১১৯
হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাত ---------- ১২১
পিতার আদেশের মর্যাদা ---------- ১২৩
আদর্শ পিতার আদর্শ সন্তান ---------- ১২৫

بسم الله الرحمن الرحيم

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

এক বুযুর্গের ইন্তিকালের পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তায়ালা মেহেরবাণী করেছেন, অন্যথায় আমি বরবাদ হয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করা হল কিভাবে? বললেন, আল্লাহ্‌ তায়ালা জানতে চেয়েছেন; আমার জন্য কি নিয়ে এসেছ? বললাম, হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার জন্য আমার ৭০ বছরের তাওহীদী ঈমান নিয়ে এসেছি। আল্লাহ্‌ তায়ালা বললেন, তাই! তাহলে অমুক দিন তোমার পেটে ব্যথা হয়েছিল, যখন মানুষ জানতে চাইল এ ব্যথা কিভাবে হয়েছে? তুমি জবাবে বললে, দুধ পানের কারণে হয়েছে, তখন তোমার তাওহীদী বিশ্বাস কোথায় ছিল?

জাগতিক জীবনে হযরত উমরের (রা.) চিন্তা-চেতনা

সাহাবায়ে কিরামগণ বললেন, হযরত উমর (রা.) বার্ধক্যে উপনীত হওয়া সত্বেও তিনি সীমাহীন পরিশ্রম করেন, এখন তাঁর কার্যক্রমে কিছুটা কাটছাট করা উচিত। পাতলা মোলায়েম বস্ত্র পরিধান করা উচিত। ভাল খানার প্রয়োজন, খাদেম রেখে খিদমতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যে তার প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে দিবে। কিন্তু এ কথাগুলো তাঁর কানে পৌছাবে কে? সাহাবায়ে কিরামগণ পরামর্শ করলেন যে, হযরত উমরের (রা.) কন্যা হযরত হাফসা (রা.) এ কাজের উপযুক্ত, সে অনুযায়ী তাঁকেই নির্বাচন করা হোক। সাহাবায়ে কিরামগণ হযরত হাফসাকে বললেন, আপনি আপনার আব্বাকে এগুলো বলুন, যদি তিনি মেনে নেন তাহলে আমাদের কথা বলে দিবেন, যদি না মানেন তবে আমাদের কথা বলার প্রয়োজন নেই। পরামর্শকারীরা ছিলেন হযরত উসমান (রা.), হযরত সা'আদ (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)। হযরত উমর (রা.) নিজ কন্যা হাফসার ঘরে আসার

পর হাফসা (রা.) বললেন, আব্বাজান! আপনার অনেক বয়স হয়েছে, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি আসে, খেলাফতের কাজ অনেক বিস্তৃত, এত কিছু করার জন্য আপনার উত্তম খানার প্রয়োজন, ভাল লেবাস পরিধান করা উচিত, কোন খাদেম নিযুক্ত করে আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো তাকে দিয়ে সমাধা করুন। এতে আপনি সামান্য বিশ্রাম নিতে পারবেন। উমর (রা.) বললেন, প্রিয় কন্যা! ঘরের লোকেরা নিশ্চয়ই জানে যে, আমার ঘরে কি আছে? হাফসা (রা.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, তুমি জান যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি কখনো পেট ভরে খাবার খাননি। হাফসা (রা.) বললেন, হ্যাঁ জানি; তিনি সকালে খেয়েছেন তো সন্ধ্যায় খাননি, আবার কখনো সন্ধ্যায় খেয়েছেন তো সকালে খাননি। উমর (রা.) আবার বললেন, তোমার কি মনে আছে? একবার তুমি টেবিলে খানা রেখেছ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনে টেবিলের উপর খানা দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা বদলে গিয়েছিল, তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ্টি সহকারে সেখান থেকে খানা উঠিয়ে মাটিতে নিয়ে খেয়েছিলেন। হাফসা (রা.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ মনে আছে। আবার বললেন, কন্যা! তোমার কি মনে আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কেবল একজোড়া কাপড়ই ছিল, ময়লা হলে নিজেই তা ধুয়ে শুকাতে দিতেন, তখন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যেত, হযরত বেলাল (রা.) আযান দিয়ে আওয়ায দিতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ নামায। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় পুরোপুরি শুকায়নি। তিনি অপেক্ষা করতেন, এভাবে এক সময় কাপড় শুকিয়ে যেত এবং তিনি সে কাপড় পরিধান করেই নামায পড়াতেন। কন্যা! তোমার মনে আছে? এক মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে দুটি চাদর হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেন, প্রথমটি পাঠানোর পর দ্বিতীয়টি পাঠাতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সে চাদর ব্যতীত অন্য কোন কাপড়ই ছিল না। তিনি সে চাদর পেচিয়ে শরীর আবৃত করলেন, এরপর নামায পড়লেন। তোমার কি তা মনে নেই? হ্যাঁ আমার মনে আছে আব্বাজান। এবার উমর (রা.) অঝোর ধারায় কান্না শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, শুনে রাখ, আমার এবং আমার সাথীদের উদাহরণ এরূপ, যেমন

তিনজন মুসাফির পথ চলছে, প্রথমজন চলতে চলতে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে গেলেন, এরপর দ্বিতীয়জনও চলতে চলতে মনযিলে পৌঁছেছেন, এবার আমার পালা। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গিয়ে মিলিত হব, আমার দুই সাথী পূর্বেই সেখানে চলে গিয়েছেন, আমাকেও সেখানেই যেতে হবে। এটাই হচ্ছে মুসলমানের জন্য দুনিয়ার জীবনের অবস্থা।

নামাযে দাঁড়িয়েই জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন

হযরত আবু রায়হানা (রা.) দ্বীনী দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সুদীর্ঘ সফরে বের হলেন এবং একদিন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময়কালে তাঁর স্ত্রী সীমাহীন অস্থিরচিত্তে প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছেন। তখন কি এক যমানা ছিল, তাঁরা কালিমার আওয়ায দূর-দুরান্তে পৌঁছানোর জন্য আনন্দের সাথে ঘর ছেড়ে বের হতেন। আবু রায়হানা (রা.) ঘরে ফিরে এসে বললেন, এখন দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিই। এশার শেষে নফলের নিয়তে দাঁড়িয়ে এমন লম্বা কিরাত শুরু করলেন যে, দুই রাকাত নামায শেষ হতেই ফযরের আযান শুরু হল।

পাঠক আপনারাই চিন্তা করুন, মানুষ দীর্ঘ সফর শেষে ঘরে ফেরার পর পরিবার-পরিজনের সাথে নিরিবিলিতে সুখ-দুঃখের দু'চারটি কথা বলা এবং শোনার জন্য মন কেমন আনচান করে!

তাঁর স্ত্রী বেজার হয়ে বললেন ঃ

يا ابا ريحانه غضبت ورجعت وتعبدت اما لنا منك نصيب؟

আবু রায়হানা! এ কেমন নির্মমতা, সুদীর্ঘ সফর শেষে আপনি ঘরে ফিরে রাতভর নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলেন, আপনার কাছে কি আমার কোন হক নেই?

আবু রায়হানা জবাব দিলেন, نسيت والله আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি আমি ভুলে গিয়েছিলাম। স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, বাইরে থাকা অবস্থায় ভুলে যাওয়া ঠিক ছিল, অথচ আমার কামরায় বসেই আমার কথা ভুলে গেলেন কি করে? স্বামী জবাব দিলেন, আল্লাহু আকবার বলেই কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করে জান্নাত জাহান্নাম নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে

গেলাম এবং সেগুলো আমার চোখের সামনে হাজির হল, ফলে অন্য কোন ভাবনাই আমার মনে স্থান পায়নি। আর আমাদের নামাযের অবস্থা হচ্ছে এমনই যে, মনেই থাকে না যে আমরা নামায পড়ছি বরং নামাযের মাঝে আমরা ব্যবসার হিসাব মিলাতে ব্যস্ত থাকি, নামায সুন্দর না করে আমরা ঘরদোর সুন্দর করার চিন্তা-ভাবনায় মশগুল থাকি, সুন্দর সুন্দর ডেকোরেশন, চেয়ার, সোফা, খাট-পালংক, এয়ার কন্ডিশন, ফ্রীজ, টেলিভিশন, দুনিয়ার যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দসহ আরো কত প্রকার ভাবনা। কিন্তু আক্ষেপ দুনিয়ার উপকরণগুলো সজ্জিত করলাম কিন্তু শরয়ী বিধানাবলীর কোন খোঁজই নিলাম না। আর যাও নিলাম তা দায়সারা গোছের কাজ ভেবে দ্রুত জাগতিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

এমতাবস্থায় নামাযের প্রকৃত হক আদায় হবে?

জান্নাতী হুর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে

ইয়ারমুক যুদ্ধে এক যুবক আবু উবায়দা (রা.)-কে বলছে, হে আবু উবায়দা (রা.) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাচ্ছি তোমার কোন পয়গাম পৌঁছানোর থাকলে বলতে পার। দেখুন কেমন জযবা, আবু উবায়দা (রা.) কান্না আরম্ভ করে বললেন, হে ভাই! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বল, আপনি আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমরা তা সত্যরূপে পেয়েছি, আল্লাহ্র মদদ আপন চোখে প্রত্যক্ষ করেছি। মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে যাচ্ছেন, এক সাহাবীর যখমী ভাতিজাকে উঠিয়ে নেয়া হল, তাঁর চাচা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের অন্তর্গত। দেখে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহ্! আমার ভাতিজাকে সুস্থ করে দাও। ভাতিজা সামান্য হুশ ফিরে পেয়ে বলল, চাচাজান! আমার জন্য দুআ করবেন না, কেননা দেখুন জান্নাতী হুর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আমার জন্য দুআ করবেন না। তাঁরাই সে সব মানুষ যারা নেক আমল করে আখিরাত লাভে ধন্য হয়েছেন।

আর আমরা জাগতিক জীবন নিয়ে এমনভাবেই নিমজ্জিত হচ্ছি যে জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরনেই আসছে না।

বাদশাহ হয়েও খাদ্য কষ্ট

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলিম শাসক উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) ঘরে প্রবেশের পর তাঁর কন্যা মুখে কাপড় দিয়ে কথা বলছিলেন। পিতা জানতে চাইলেন, কন্যা তুমি কেন মুখে কাপড় দিয়ে কথা বলছ? কন্যা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়ার পূর্বেই খাদেমা ক্রন্দন করে বলতে লাগল; আমীরুল মুমিনীন! আপনি হয়তো জানেন না যে, আপনার আদরের দুলালী আজ কাঁচা পিঁয়াজ এবং শুকনা রুটি দিয়ে খাদ্যের প্রয়োজন মিটিয়েছে।

আমাদের সমাজ জীবনে মজুরের ঘরেও হয়তো শুধু পিঁয়াজ আর শুকনা রুটি দিয়ে আহার করা হয়না, অথচ সুবিশাল সাম্রাজ্যের শাসকের পরিবারের কি দুরাবস্থা! এরূপ অবস্থার কথা কি কল্পনা করা যায়।

দাসীর কথায় হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) কাঁদতে লাগলেন। কোন পিতা তার সন্তানের দুরাবস্থার কথা শুনে সহ্য করতে পারে? তিনি বললেন, প্রিয় কন্যা! আমি তোমাকে পৃথিবীর সর্বাধিক সুস্বাদু খাবার খাওয়াতে পারি, কিন্তু আমি আল্লাহ্ তায়ালা এবং জাহান্নামের আগুনকে ভয় করি। ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহ্ তায়ালা হয়তো তোমাকে এর চেয়ে ভাল খাবার খাওয়াবেন। নেককারদের জন্য আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে প্রতিপালন করবেন, হারামের জন্য আল্লাহ্র কোন ওয়াদা নেই। তাঁদের জন্য এরূপ ওয়াদা রয়েছে, তাঁদেরকে অপদস্থ করা হবে উভয় জাহানে। যারা সন্তান সন্ততির জন্য হারাম সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করেছে তারা কবর জগতে বসে সন্তান-সন্ততির জন্য কান্নাকাটি করে আর নিজের জন্য তো করেই।

তবে তাদের সে কান্নার আওয়াজ জ্বীন-ইনসান ব্যতীত সকল সৃষ্ট জীবই শোনতে পায়।

দুনিয়ার মোয়ামেলা

স্বপ্নে হযরত ঈসা (আ.) একটি গাভীর মাথা ফাটা এবং গলা কাটা অবস্থায় দেখে, জানতে চাইলেন, তোমার পরিচয় কি? সে জবাবে বলল, আমি দুনিয়া। বললেন, তোমার এ অবস্থা কেন? উত্তর দিল, যারা আমার প্রেমে নিমজ্জিত এবং আমার পিছনে ছুটে বেড়ায় তারা আমার গলা কেটে দিয়েছে কিন্তু আমায় কাবু করতে পারেনি। ঈসা (আ.) জানতে চাইলেন,

তোমার মাথা ফাটা কেন? বলল, যারা আমাকে ছেড়ে পলায়ন করে আমি তাদের পিছনে ধাবিত হই, তারা আঘাত করে করে আমায় যখম করে দিয়েছে, আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারিনি।

দ্বীনী কাজে কোরবান এক ব্যক্তির কাহিনী

রাশিয়ান জামাতে তাবলীগের এক সাথী অন্তর্ভুক্ত হল। এ সময়কালে তার ব্যবসায় প্রায় ষোল লক্ষ রুপীর লোকশান হয়ে গেল। ঘরে ফিরে আসার পর আত্মীয়-স্বজন তার ঘুম হারাম করে দিল। তাবলীগ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ পরিবারই ধ্বংস করে দিয়েছে--। একবার সাথীদের নিয়ে আমি বাজারে গাশ্‌ত করছিলাম সেখানে সে ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল। তার পাশের ব্যবসায়ী বলল, মাওলানা সাহেব! এ কেমন তাবলীগের কাজ। এ ব্যক্তির পরিবার অর্থের অভাবে এখন ধ্বংসের মুখে পড়েছে। ষোল লাখের উপর ক্ষতি হয়ে গিয়েছে----। আমি তাকে বললাম, তোমাকে ধন্যবাদ। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। বললাম, আসল কথা হচ্ছে ক্ষতি তার তাকদীরে লেখা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন; যে মুসীবত অনিবার্য তা কেউ সরাতে পারেনা আর যে সুখ আসবে তাকে কেউ ঠেকাতে পারেনা। তার এ মুসীবত ছিল অনিবার্য। তোমাদের এ বাজারে প্রতিদিন ব্যবসায় কারো না কারো ক্ষতি হয়। তোমরা সেজন্য কখনো চিন্তা-ভাবনা অথবা হৈচৈ করেছ? কখনো বলেছ যে, তার বাচ্চারা ভুখা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। অনেকে সুদের কারবারে একসময় দেউলিয়া হয়ে যায়। আর সে তাবলীগে সময় ব্যয় করেছে, তার ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে সে জন্যই হৈচৈ করছ। তার ক্ষতি হতই, কিন্তু সে সৌভাগ্যবান যে, তার ক্ষতি সাহাবায়ে কিরামের ক্ষতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

মক্কাবাসীর আত্মত্যাগ

সেই যে বড় সর্দার মক্কা মোকাররমা ছেড়ে রওয়ানা হল। তাদের গন্তব্য স্থান ছিল শাম দেশ। হযরত হারেস যেতে উদ্যত হলে মক্কাবাসী কান্না জুড়ে দিল। তিনি আবু জাহলের ছোট ভাই, দানশীল হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। হারেস মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে মক্কা ছেড়ে যাচ্ছি না, এক গুরুতর দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে, তা পালনের জন্যই যাচ্ছি। আমার অনেক দেরী হয়ে

গেছে, পূর্ববর্তীদের পদাংক অনুসরণ করে আমি আমার জীবন কোরবান করতে চাই, যেন তাঁদের পূর্বে না হলেও তাঁদের একই কাতারে থাকতে পারি। যখন তিনি শাম দেশে পৌঁছলেন, তখন ইয়ারমুকের পরিস্থিতি ছিল খুবই গরম। রোমান সম্রাট তিন লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেছিল, তাদের বিপরীতে মুসলিম মুজাহিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ছাব্বিশ হাজার। নেতৃত্বে ছিলেন হযরত মালিক বিন ওয়ালিদ। লাগাতার নয় দিন যুদ্ধ চলল, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলত, শেষ দিন হযরত মালিক (রা.) মাথার লৌহ শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললেন, বর্ম খুলে মাথায় পাগড়ী বাঁধলেন, শরীরে কাফনের কাপড় জড়িয়ে বললেন, من يبايعنى على الموت এসো কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইআত নিবে?

খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তার মামাতো ভাই, হাতে হাত রেখে বললেন, না না এখনো তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। তিনি হাত ছাড়িয়ে বললেন, পিছনে সরে যাও انى وابى كان من اشد الناس عداوة رسول الله আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি এবং আমার পিতা সারাজীবন ইসলামের বিরোধিতা করেছি আজ এর শোধ দিতে চাই, আজ আমি হেরে যাব তা হতেই পারে না। সর্বপ্রথম তাঁর পুত্র হাতে হাত রাখল, আমের বিন ইকরাম এরপর হারেস বিন হিশাম, সুহাইল বিন আমার, আবু সুফিয়ান। সিরিয়ায় তাঁদের সবার কবর বিদ্যমান যা দেখে জিহাদের আগ্রহ তাজা হয়। একেক জনের কবরের সামনে গেলে চোখ দিয়ে এত পানি প্রবাহিত হয় যা বোঝানো যাবে না। তাঁরা তাঁদের জীবনকে টুকরা টুকরা করে আমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছিয়েছেন। সেদিন চারশত কুরাইশ সর্দার হাতে হাত রেখেছেন, সেখানে লড়তে লড়তে তারা আপন আপন তলোয়ারের বাটও ভেঙ্গেছেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের খিমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নেয়া হল, আল্লাহ্‌ তায়ালা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত পিছু ফিরবে না। সেখানে চারশত জানবায মুজাহিদের আত্মত্যাগে রোমান সৈন্যকে পলায়নে বাধ্য করল আর আল্লাহ্‌ তায়ালা লড়াইর ফয়সালা করে দিলেন। কাফেরদের সেনাপতি প্রাণ হারাল এবং সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) সহযোদ্ধাদের মাঝে ফিরে আসার পর দেখলেন

পিতা-পুত্রের নিষ্প্রাণ দেহ পড়ে রয়েছে। হযরত আকরামার নিঃশ্বাস কোন রকম প্রবাহিত হচ্ছিল, পুত্র পূর্বেই শাহাদত বরণ করেছে। খালিদ (রা.) চিৎকার করলেন, হায়! এরপর বললেন, هذا لايموت সর্দার এভাবে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয়। তাঁর পুত্রকে উঠিয়ে পায়ের কাছে রেখে আকরামার (রা.) মাথা কোলে তুলে নিলেন, চোখ দিয়ে পানি প্রবাহিত হলে আকরামা (রা.) অতিকষ্টে চোখ খুলে বললেন, من اقترب কার বিষয়ে ফয়সালা হয়েছে। بشروا। আল্লাহ্ বিজয় দান করেছেন। উমর (রা.)-কে আমার পয়গাম পৌছে দিও যে, তোমার কথা আমরা বাস্তবায়িত করেছি। এর পরপরই তাঁর ইন্তিকাল হল। খালিদ (রা.) অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে বললেন, كلادع بن حنتمة الامستشهد হানতামার বেটা এখন বলতে পারবে না যে, আমরা জীবন বিসর্জন দিইনি। হানতামা হযরত উমরের (রা.) মাতার নাম। আরব প্রচলনে কেউ রাগান্বিত হলে মায়ের নামে সন্তানের পরিচয় উল্লেখ করত। এ ঘটনাবলী হযরত উমরের (রা.) সাথে সম্পৃক্ত, যে সম্পর্কে খালিদ (রা.) অবগত ছিলেন। পিছনের দৃশ্যাবলী চোখের সামনে ফুটে ওঠায় অনিচ্ছাকৃত তাঁর মুখ দিয়ে বের হল, হানতামার পুত্র একথা বলতে পারবে না যে, আমরা জীবন বিসর্জন দিইনি। ইসলাম যিন্দা হল। আমরা তাঁদের উত্তরসূরী, তাঁরাই আমাদের পূর্বসূরী, অতএব আমাদের সব কিছুতেই তাঁদের কথা স্মরণে রাখতে হবে।

জনৈক ইয়াহুদী সন্তানের ঈমান আনয়ন

এক ইয়াহুদীর সন্তান প্রায়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে বসত, কিছু দিন তার অনুপস্থিতি দৃষ্টে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন সে ইয়াহুদীর সন্তান কোথায়? উত্তর এল, সে অসুস্থ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চল আমরা তার খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার ঘরে উপস্থিত হলেন তখন সে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কালিমা পড়। অসুস্থ সন্তান পিতার দিকে তাকালে পিতা বলল, তিনি যা বলছেন, তুমি তা কবুল কর। সন্তান অনতিবিলম্বে কালিমা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণ চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দের সাথে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

কুদরতী সৈন্যবাহিনী

হযরত ইবরাহীম (আ.) নমরুদের মোকাবেলায় কালিমার আওয়ায বুলন্দ করলেন। আল্লাহ্র কুদরতে সামান্য মশা দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, নাফরমানদের শায়েস্তা করার জন্য তিনি সর্বদা বিদ্যমান রয়েছেন।

কুদরতী মশক বাহিনীর আক্রমণে নমরূদ বাহিনী হেস্তনেস্ত হয়েছে। নমরুদ পলায়ন করে নিজের মহলে আশ্রয় নিয়ে স্ত্রীকে বলল, আমার লশকর মশার আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, বলতে বলতে হঠাৎ একটি মশা তার নাকের ছিদ্রপথে প্রবেশ করে মস্তিস্কে পৌছে গেল। মশার দংশনে অস্থির হয়ে নমরুদ মাথায় জুতা দ্বারা আঘাত করতে লাগল, আর এভাবেই এক সময় তার মৃত্যু হল। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা সামান্য মশার মাধ্যমে কালিমার শক্তির প্রকাশ ঘটালেন।

গুই সাপের সাক্ষ্য প্রদান

একবার এক গ্রামের বাসিন্দা একটি মৃত গুই সাপ হাতে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হয়ে গুই সাপটিকে রহমতের নবীর সামনে রেখে তাচ্ছিল্যসহকারে বলল, যতক্ষণ না এ গুই সাপ তোমার নবুওয়াতীর স্বীকৃতি দিবে আমিও তোমাকে নবী হিসেবে স্বীকার করব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত গুই সাপকে লক্ষ্য করে বললেন, হে গুইসাপ! উপস্থিত সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে গুই সাপ জবাব দিল, লাব্বাইক! আমি হাযির আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় ইরশাদ করলেন, তুমি কার ইবাদত কর? কালবিলম্ব না করে অবোধ গুই সাপটি জবাব দিল, আমি তাঁর বন্দেগী করি যার সিংহাসন আসমানে আর সাম্রাজ্য যমীনে। তাঁর রাস্তা সমুদ্র মাঝে, রহমত জান্নাতে এবং আযাব জাহান্নামে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রাম্য ব্যক্তিকে বললেন, এবার বল আমি কে? সে উত্তর দিল আপনি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আপনার স্বীকৃতিদাতাগণ সফলকাম আর অস্বীকারকারীগণ চূড়ান্তভাবেই ব্যর্থ।

হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য দরিয়ার মধ্যখানে রাস্তা

মূসা (আ.) চল্লিশ বছর দীর্ঘ সাধনা শেষে আপন কওমের মাঝে নবুওয়াতীর দাওয়াত নিয়ে এলেন। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, তোমার

কালিমার শিক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এবার মানুষের মাঝে কালিমার আওয়ায বুলন্দ কর। হযরত মূসা (আ.) কওমসহ ছুটছেন, পিছনে সসৈন্যে ফিরাউন তাঁদের পশ্চাদ্বাবন করছে। সবাই সীমাহীন পেরেশান হয়ে ভাবছিল এখন কি হবে? মূসা (আ.) উত্তর দিলেন নিশ্চয়ই আমার আল্লাহ্ আমার সাথে রয়েছেন। তিনিই আমাকে রাস্তা দেখাবেন। নীল নদের তীরে পৌঁছে মূসা (আ.) আল্লাহ্র নির্দেশে পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। এবার চোখের পলকে পানি দুদিকে সরে গিয়ে ১২টি রাস্তা তৈরি হল। আল্লাহ্র কুদরতে বনী ইসরাঈল ও মূসা (আ.) নদী পাড় হল আর এদিকে ফিরাউন তার বাহিনীসহ সে পথে আসতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করল।

বৈশিষ্ট্যসহ জান্নাতের বৃক্ষের বর্ণনা

আল্লাহ্ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে আমার কাছে এনে আবার পাঠিয়ে দিব, তুমি আমার আখেরী নবীর উম্মতের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করবে। আমি তাদের জন্য তূবা সৃষ্টি করেছি। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ্! তূবা কি বস্তু? আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, তূবা সে বৃক্ষ যাকে আমি নিজ হাতে রোপন করেছি। এর মূল স্বর্ণ ও উপরিভাগ জওয়াহেরাতে তৈরী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে তূবা বৃক্ষের পরিচয় দিয়েছেন একটি হাদীসে, এর মূল স্বর্ণ নির্মিত। তা এত প্রশস্ত যে, তুমি যদি তোমার পাঁচ বছর বয়সী উটের পীঠে সওয়ার হও এবং উট সে বৃক্ষের গোড়া লক্ষ্য করে দৌড় আরম্ভ করে, তাহলে সে দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় বৃদ্ধ হয়ে যাবে, এর হাড্ডিগুলো ভেঙ্গে যাবে, সে তবুও সে বৃক্ষের প্রশস্ততা অতিক্রম করতে পারবে না। এর মূলের খামিরা অতি সুমিষ্ট এবং এর শাখা থেকে রেশম সৃষ্টি হয়, এর পত্রপল্লব যখন পরস্পরের সাথে ধাক্কা খায়, তখন প্রাণকাড়া আওয়ায বের হয়, এর শেকড় থেকে তিনটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا একটি নাম সালসাবীল, একটি মাঈন وَكَاْسٌ مِنْ مَعِيْنٍ لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ আকেরটির নাম রাহীক।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَخْتُوْمٍ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ -

একটি ঝর্ণার নাম মাঈন, একটি রাহীক এবং সর্বশেষটির নাম সালসাবীল। ঝর্ণাগুলো এমন বিস্ময়কর যে, যদি সেগুলোর একফোটা পানি আঙ্গুলে লাগানো হয়, এরপর আসমানকে যমীনে টেনে আনা হয়, তাহলে আসমান যমীন সে এক ফোটা পানির সুঘ্রাণে বিভোর হয়ে পড়বে। তাহলে যে ব্যক্তি বিনা হিসাবে সেখানে থেকে পানি উত্তোলন করবে এবং এর কিনারে বসে ক্রমাগত পান করবে এর পরিতৃপ্তি সম্পর্কে আমরা কি কোন ধারণা করতে পারব?

হযরত ঈসা (আ.) বললেন, ইয়া আল্লাহ্! সে পানি আমাকেও পান করার সৌভাগ্য দান করুন। (ইবনে কাসীর)। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, হে ঈসা! আমার প্রিয় হাবীব, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করার পূর্ব পর্যন্ত সকল আম্বিয়াদের জন্য সে ঝর্ণা সমূহের পানি স্পর্শ করা হারাম। সকল উম্মতের জন্য সে পানি হারাম যতক্ষণ না সে নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত এর পানি পান করে।

ইয়েমেনের জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী

ইয়েমেনের এক জ্যোতিষী কখনো ঘর ছেড়ে বের হত না। যে দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম নিয়ে এ দুনিয়াতে পদার্পণ করেন সে জ্যোতিষী কি এক অজানা ভয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে বলতে লাগল, হে ইয়েমেনের অধিবাসীগণ! আজ থেকে প্রতিমা যুগের অবসান হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের দিন বড় বড় মন্দিরের নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোর মুখ থেকে বিস্ময়করভাবে উচ্চারিত হচ্ছিল, আমাদের যুগ সমাপ্ত হয়েছে, এবার আখেরী যমানার নবীর যুগ আরম্ভ হল অর্থাৎ মূর্তি ধ্বংসকারীর যমানা শুরু হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে মূর্তির অপসারণ শুরু হল। তিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করাকালীন সেখানে তিনশত ষাটটি মূর্তি বিদ্যমান ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ করছেন আর একেকটি মূর্তির দিকে আঙ্গুল ইশারা করে কুরআনের এ আয়াত উচ্চকণ্ঠে পাঠ করছেন–

حَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত– মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এ আয়াত পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগুলো ক্রমাগত ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধুলিসাৎ

হল। এভাবেই অনবরত পাঠ করলেন আর ৩৬০টি মূর্তি একের পর এক ভেঙ্গে অস্তিত্ববিহীন হল। তখন কামান মজুদ ছিল না, কিন্তু বহুপ্রাচীন মূর্তিগুলো ভাঙ্গার জন্য রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের ইশারার চেয়ে শক্তিশালী আর কিছুই ছিল না। এভাবেই কালিমাওয়ালা কাবা ঘর থেকে মূর্তি উধাও করে দিলেন।

কুকুরের ওয়াফাদারীর একটি অনুপম কাহিনী

আমাদের জন্য প্রাণীর কাছ থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। জাপানের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন, স্টেশন পর্যন্ত নিজ পালিত কুকুরটিকে সাথে নিতেন এবং কুকুরটি স্বীয় প্রভুকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে আসত। বেলা তিনটায় কুকুরটি মালিককে নিয়ে আসার জন্য পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেত। একবার প্রফেসর সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্ট এটাকের শিকার হলে তাকে হাসপাতালে নেয়া হল এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। সেদিন কুকুরটি ঠিক তিনটার সময় মালিককে নিয়ে আসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হল। মালিকের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে সে ঘরে ফিরে এল। পরের দিনও ঠিক তিনটায় কুকুরটি পূর্বের স্থানে মালিকের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। এভাবেই দীর্ঘ নয় বছর নিয়মিত অপেক্ষা করে করে এক সময় কুকুরটি সেখানেই মারা গেল। পরবর্তীতে প্রভুভক্তির স্বীকৃতি স্বরূপ এ কুকুরটির স্মরণে পাথর দ্বারা এর একটি ভাস্কর্য তৈরি করে সেখানেই স্থাপন করা হয়েছে। নির্বোধ কুকুর এত বড় প্রভু ভক্তির প্রমাণ দিল। আর আমরা তো সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। আমরা এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করি কি?

জনৈক সাহাবী কর্তৃক আল্লাহ্র মহব্বতে মদ এবং সুন্দরী নারী পরিত্যাগ

কাফের সম্প্রদায় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হুজায়ফাহ্ (রা.)-কে কয়েদ করার পর বলা হল, ঈসায়ী হয়ে যাও। এজন্য অনেক প্রলোভন দেয়া হল, তিনি তাদের সকল প্রলোভনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর তারা এ সদ্যহাস্যোজ্জল সাহাবীকে নিয়ে এক ভয়ংকর চক্রান্তে মেতে উঠল। তিনি মাঝে মাঝে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসিয়ে

দিতেন, ঠাট্টা করে তার সমবয়সী সাহাবীগণ তাকে হিমার (গাধা) নামে সম্বোধন করতেন। একবার কেউ একজন অভিযোগ করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ আবদুল্লাহ্ বিন হুজায়ফাহ্ অনেক ঠাট্টা-মশকরা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে কিছু বলবে না কারণ সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে মহব্বত করে।

এবার ঈসায়ীগণ তাঁর বিরুদ্ধে সর্বশেষ অস্ত্র প্রয়োগ করার হীনমানসে এক অনিন্দ্য সুন্দরী ঈসায়ী যুবতীকে তাঁর কামরায় রেখে গেল। তার সাথে মদ এবং শুকরের গোশত সেখানে হাযির করল। যুবতীকে বলা হল, তাঁকে যেকোন ভাবে তোমার সাথে যিনায় লিপ্ত কর। সে তোমার চক্রান্তে পা দিলে ইসলাম ছেড়ে ঈসায়ী হয়ে যাবে। তিনদিন এবং তিনরাত ঈসায়ী যুবতী বিরামহীন প্রচেষ্টা সত্বেও নিজের দিকে আবদুল্লাহ বিন হুজায়ফাহ্কে তার দিকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হল।

হাফেজে কুরআনের মর্যাদা

জান্নাতে রাইয়ান নামক এক নহর রয়েছে যার কিনারায় থাকবে মুক্তাদানা খচিত এক শহর এবং তা স্বর্ণ এবং রূপা দ্বারা নির্মিত। এ শহরের ৭০ হাজার দরজা থাকবে যা কুরআন বহনকারীদের জন্য নির্মিত হয়েছে।

এখানে হাফেযে কুরআনের স্থলে হামিলে কুরআন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ তাঁরা কুরআন বহন করে চলছেন, এর মাঝে ওলামায়ে কিরামের পাশাপাশি হাফেযে কুরআনগণও অন্তর্ভূক্ত হবেন। আমল শর্ত নয় বরং হিফয করার কারণেই তারা এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন। আর যদি কেউ সীনার ভেতর সংরক্ষণের পাশাপাশি আমলকেও যুক্ত করতে পারেন এবং তদনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করেন, তাহলে نُورٌ عَلَى نُورٍ তাঁদের শুধুমাত্র একটি মহল প্রদান করা হবে সেখানে প্রবেশের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত ৭০ হাজার দরজা তার সামনে উন্মুক্ত থাকবে। সে এর ভেতরে আসন গ্রহণ করার পর প্রধান ফটক দিয়ে ৭০ হাজার ফেরেশতা সসম্ভ্রমে তার সামনে এসে বলবে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপনাকে সালাম প্রদান করেছেন। এরপর বিভিন্ন ধরনের ৭০ হাজার হাদিয়া তাঁর সামনে পেশ করে বলবে, এগুলো আপনার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা পাঠিয়েছেন। এরপর তারা বিদায় নিয়ে চলে যাবেন। দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ১ লাখ ৪০ হাজার

ফেরেশতা তাঁর সামনে সালাম প্রদান পূর্বক হাদিয়া তোহফা পেশ করে বলবেন, এগুলো আল্লাহ্ তায়ালা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। হাদিয়া পৌঁছে দিয়ে তাঁরাও বিদায় নেবেন। এবার তৃতীয় দরজা দিয়ে দুই লাখ আশি হাজার ফেরেশতা সামনে এসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম এবং বিভিন্ন হাদিয়া পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিবেন। ৪র্থ দরজা দিয়ে ৫ লাখ ৬০ হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে সালাম এবং ৫ লাখ ৬০ হাজার হাদিয়া পেশ করে চলে যাবেন। এরপর ৫ম দরজা দিয়ে পূর্বের দ্বিগুণ ফেরেশতা প্রবেশ করবেন এবং ক্রমাগত প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে পূর্বের দরজার দ্বিগুণ ফেরেশতা প্রবেশ করে সালাম ও হাদিয়া প্রদান করবেন। দুনিয়ার লোকেরা তো ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করত "অসহায় ইমাম সাহেব" "বেচারা মৌলভী সাহেব" মানুষের বাড়ি খেয়ে জীবন ধারণ করে, কিন্তু সে অসহায় ছন্নছাড়া মানুষগুলো কিন্তু কিয়ামতের দিন এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন।

ক্ষুধার তাড়না আমাকেও বাইরে আসতে বাধ্য করেছে

ঠাণ্ডা দিনে হযরত আলী (রা.) বাইরে ছিলেন। কোন কারণে তাঁর মনে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ইত্যবসরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে এসে বললেন, হে আলী! এ ঠাণ্ডায় বাইরে কি করছ? উত্তর দিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কি করব? এমন প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে যে, ঘরে বসে থাকতে পারছি না। কনকনে ঠাণ্ডায় ক্ষুধা আরো তীব্ররূপে অনুভূত হচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী, আমি নিজেও ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার তাড়না আমাকেও বাইরে আসতে বাধ্য করেছে। তাঁরা উভয়েই কিছু দূর অগ্রসর হয়ে কতিপয় সাহাবীর কাছে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, তোমরা এখানে কি করছ? তাঁরা নিচু স্বরে উত্তর দিলেন, হে রাসূলাল্লাহ্! ক্ষুধার তাড়নায় বাইরে এসেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলী! ঐ খেজুর গাছটিকে বল যে, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিচ্ছেন তুমি আমাদেরকে খেজুর খাওয়াও। হযরত আলী দ্রুত পায়ে গিয়ে খেজুর গাছটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ শোনানো মাত্রই গাছ থেকে বৃষ্টির ন্যায় খেজুর মাটিতে পড়া শুরু করল।

আর আমরা মানুষ হিসাবে শ্রেষ্ঠজীব। আমাদের তুলনায় সে নিষ্প্রাণ খেজুরগুলো কত যে অনুগত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

আদেশ শোনার সাথে সাথেই তা তামিল করল। হযরত আলী (রা.) সব খেজুর উঠিয়ে সামনে এনে সকলকে পরিতৃপ্ত সহকারে খাওয়ালেন। কিছু অবশিষ্ট ছিল। নির্দেশ দিলেন যাও এগুলো ফাতিমাকে দিয়ে এস। এ ছিল রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষা ও আদর্শ। নিজেও খাবে অন্যকেও খাওয়াবে।

আমি তাঁকে এক দিলে তিনি আমায় দশ দিবেন

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর শাসনামলে মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এমতাবস্থায় উসমান (রা.)-এর কাছে বিপুল পরিমাণ ব্যবসাদ্রব্য মওজুদ ছিল, অভাবের সময় মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয়, ব্যবসায়ীরা তাদের মালসামান জমা করে রাখে এবং অধিক লাভে বিক্রি করে অসহায় বিপন্ন মানুষের রক্ত শুষে নেয়। তিনি কিন্তু তেমন ব্যবসায়ী ছিলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ আদর্শ তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। শতাধিক উটের পিঠে বোঝাই করা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী শহরে প্রবেশ করার পর সুযোগ সন্ধানী ব্যবসায়ীরা ছুটে এসে বলল, হযরত! কত দাম নিবেন? উসমান (রা.) বললেন, তোমরা কত দিবে? তারা বলল, আমরা দশ দীনারের জিনিস বার দীনারে ক্রয় করব। বললেন, এখন জিনিসপত্রের দাম বেশী, তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে বলতে হবে। তারা বলল, আমরা দশ দীনারের জিনিস চৌদ্দ দীনারে ক্রয় করব। তিনি বললেন, আরো বেশী বল। বলল আমরা দশের স্থলে পনের দিব, আর বাড়াতে পারব না। মদীনার সকল ব্যবসায়ী সমস্বরে জানতে চাইল, আপনাকে এর চেয়ে অধিক মূল্য প্রদানের ব্যাপারে কে কথা দিয়েছে? উসমান (রা.) বললেন, আমার আল্লাহ্ পূর্বেই ওয়াদা করেছেন যে, আমি তাঁকে এক দিলে তিনি আমায় দশ দিবেন مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا আমি তোমাদের সকলকে সাক্ষী করে বলছি, আমার যাবতীয় মাল এ দুর্ভিক্ষের সময় মদীনাবাসীর জন্য বিনামূল্যে উৎসর্গ করলাম।

রাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) স্বপ্নে দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা বর্ণের ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দেহে সবুজ রঙের পোশাক পরিধান করে দ্রুত ছুটতে প্রস্তুত হয়েছেন।

এমতাবস্থায় ইবনে আব্বাস (রা.) দৌড়ে তাঁর ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে কথা বলতে এবং আপনার পাশে বসতে মন ব্যাকুল হয়ে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজ উসমান আল্লাহ্র নামে যে সদকা করেছে তা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়েছে, আল্লাহ্ এক জান্নাতী হুরের সাথে তাঁর শাদী দিয়েছেন তাঁর ওলীমায় সকল জান্নাতীকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, আমিও তাঁর ওলীমায় শরীক হতে সেখানেই যাচ্ছি।

হযরত আলী (রা.)-এর এখলাস

হযরত আলী (রা.) ইয়াহুদীর সীনার উপর চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। তখন সে ইয়াহুদী জীবন রক্ষার্থে আলীর মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে হযরত আলী (রা.) তাকে ছেড়ে পিছু হটলেন। বললেন, দ্বিতীয় বার আমার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হও। সে হয়রান হয়ে বলল, কেন? আলী (রা.) উত্তর দিলেন, প্রথমে তোমাকে আমি আল্লাহ্ এবং রাসূলের স্বার্থে কতল করতে চাচ্ছিলাম, যখন তুমি আমার চেহারায় থুথু দিলে তখন আমার ব্যক্তিগত ক্রোধও এর সাথে যুক্ত হল। এবার আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টির উপর ক্রোধ প্রাধান্য পেল। এমন মাধুর্যময় বাণী শোনামাত্রাই ইয়াহুদী কালিমা পড়ে মুসলমানে পরিণত হল।

সাহাবায়ে কিরামদের (রা.) আত্মত্যাগের কাহিনী

কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাফর (রা.)-এর একহাত কাটা গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। রাসূলের সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, আহ! জাফর আগাচ্ছে, এই মাত্র তার এক হাত কাটা গেল এবং দ্বিতীয় হাতও। এগুলো রাসূল মসজিদে বসেই বলে দিচ্ছেন এবং বললেন, জাফর দ্বি-খন্ডিত হয়ে গেল আর সে জান্নাতে প্রবেশ করল।

আবদুল্লাহ্ (রা.) তাঁর ঝাণ্ডা তুলে নিলেন, তিনি রাসূলের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করতেন। হুদায়বিয়ায় আসার পর ফিরে যেতে হয়েছিল, পরবর্তী বছর যখন ওমরাহ করতে আসেন, তখন আবদুল্লাহ (রা.) রাসূলের উটের রশি হাতে নিয়ে আগে আগে চলছিলেন, আর নীচের কবিতাগুলো আবৃত্তি করছিলেন–

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّارَ عَنِ السَّبِيْلِ * وَخَلُّوْا كُلَّ الْخَيْلِ فِىْ سَبِيْلٍ
اَلْيَوْمُ غُدَكُمْ عَلٰى التَّنْزِيْلِ * كَمَا قَتَلْنَا بِهِمْ عَلٰى تَحْوِيْلِ
ضَرَبَا تُزِيْدُ عَمَّا عَنْ تَقْبِيْلِ * وَيَصْدُرُ الْخَلِيْلُ عَنِ الْخَلِيْلِ

তখন এক সাহাবী বললেন, তুমি কবিতা আবৃত্তি করছ? এসব রেখে আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর, উত্তরে তিনি বললেন, চুপ কর! এ কবিতাগুলো তীর থেকেও তীব্রভাবে দুশমনের বুকে বিদ্ধ হচ্ছে। সে আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রা.) ঝান্ডা হাতে নিলেন। তাঁর চার স্ত্রী ছিল, সন্তানাদি এবং অনেক দাস-দাসী ছিল, খেত-খামার ছিল প্রচুর, বিরাট সম্পদশালী ছিলেন তিনি। এসব কিছুর কথা মনে জাগতেই মনকে ধমকে দিয়ে বলতেন, কিসের আকাঙ্খা করছ তুমি? স্ত্রীদের সকলকেই তালাক দিয়ে দিলেন, দাস-দাসীর সকলকে আযাদ করে দিলেন, খেত-খামারের সব কিছু কে আল্লাহ্র রাহে দান করে দিলেন এবং বলতে লাগলেন।

اَقْسَمْتُ يَانَفْسِ لَتَنْزِلَنَّ * كَارِهَةٍ لَعَنَ اَوْلَتَطَاوَلِ بِهِنَّ
اَيْنَ اَجْرَدَ الطَّنَّاسَ وَشَدِهْنَ * مَنْ رَاكَ تُكْرِهْنَ الْجَنَّةَ
قُلْ اَطَلَّ مَنْ كُنْتَ مُطْعِئَنَةٍ * هَلْ اَنْتَ اِلَّا نُطْفَةٌ فِى الشَّنَةِ

হে নফস! তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিচ্ছি, তোমাকে আগে বাড়তে হবে, তোমার মন সায় দিক না নাদিক তোমাকে আল্লাহ্র রাহে কুরবান হতে হবে। এ বলেই তিনি প্রচণ্ডরূপে অগ্রসর হলেন এবং শাহাদাতের মহান মর্যাদায় ধন্য হলেন। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে বের হয়ে হযরত যায়েদের ঘরে গেলেন। ইতোমধ্যে তিনিও শাহাদাতের পিয়ালা পানে ধন্য হলেন। রাসূল তাঁকে নিজের সন্তান রূপে পরিচয় প্রদান করতেন।

রাসূল (সা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই তাঁর ছোট মেয়ে রাসূলের পা জাপটে ধরল, রাসূল (সা) তাকে কোলে তোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন, অত্যন্ত কঠিন মানুষ সাবেত লুবাবা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কেমন কান্না, জবাবে রাসূল বললেন, هٰذَا شَوْقُ الْحَبِيْبِ اِلَى الْحَبِيْبِ

এটা বন্ধুর জন্য বন্ধুর কান্না, রাসূলের বলা এ পবিত্র বাক্যটি হযরত বিন হারেসার (রা.) কবরে লিপিবদ্ধ আছে। আমি যখন এ হাদীস পাঠ করি তখন আমার এমন কান্না এসেছিল যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

আল্লাহ্ তায়ালার খাজানা অফুরন্ত

হযরত জাবির (রা.) দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছে। তিনি কোন স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কাছে খাবার জাতীয় কিছু থাকলে দাও। স্ত্রী বললেন, এ বকরীর বাচ্চা এবং সামান্য জব আছে। জাবির (রা.) বললেন, জব পিষে নিয়ে এস এবং বকরীর বাচ্চা রান্না কর। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে আসছি। জাবির (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সহ চৌদ্দজনের কিংবা আপনি সহ পনেরো জনের খানার ব্যবস্থা করেছি। অনুগ্রহ করে আপনি তাশরীফ রাখুন। তখন আনুমানিক দেড় হাজার সাহাবী খন্দক খনন করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খন্দকবাসীগণ! জাবির তোমাদের জন্য রুটি বানিয়েছে। একথা শোনামাত্র হযরত জাবিরের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হল। ভাবলেন, আমি ব্যবস্থা করেছি পনেরো জনের এখানে পনেরো শত সাহাবী উপস্থিত। হে আল্লাহ্! আমি এখন কি করব? তিনি দ্রুত ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনে থেকে বললেন, আরে জাবির! আমি জানি তুমি ছোট হাঁড়িতে রুটি তৈরী করেছ। আমি না যাওয়া পর্যন্ত হাঁড়ি নীচে নামিয়ো না। এরপর তিনি জাবিরের ঘরে হাযির হয়ে হাঁড়ি নীচে নামালেন, মুখ থেকে সামান্য থুথু ছিটিয়ে দিলেন, রুটি নিজের কাছে রাখলেন। দস্তরখানা বিছানোর পর বললেন, সবাই বসে খাওয়া শুরু কর। রুটি তরকারী প্রয়োজন মত বন্টন করছেন। সবাই তৃপ্তিসহ খাচ্ছেন। এভাবেই একের পর এক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল খাওয়া সেরে পরবর্তীদের জন্য আসন ছাড়ছেন। দেড় হাজার ব্যক্তি খাওয়া সম্পন্ন করলেন। রুটি এবং সামান্য বাচ্চার গোশত পূর্ণরূপেই পাত্রে অবশিষ্ট আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দস্তরখানের সকল হাড্ডি জমা কর। নির্দেশ মোতাবেক হাড্ডি জড় করে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে রাখা হল। তিনি তা উঠিয়ে দো'আ করলেন, আল্লাহ্ জাবিরের জবেহকৃত বকরীকে পুনরায় প্রাণ দান কর। হযরত জাবিরকে বললেন, জাবির! আমাদের আল্লাহ্ আমাদেরকে খানা খাইয়েছেন। এবার তুমি তোমার বকরী এবং রুটি নিয়ে যাও।

হযরত আলী (রা.)-এর নামাযে একাগ্রতা

হযরত আলী (রা.)-এর রানে তীর ঢুকে ভেতরে আটকে গেল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও বের করা সম্ভব হল না। সীমাহীন যন্ত্রণায় তাঁর দেহ অবশ হয়ে এল। তিনি বললেন, এখন থাক নামায আদায় করি এরপর বের করা যাবে। তিনি মসজিদে গিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। কয়েকজন এসে নামায অবস্থায় তাঁর শরীর থেকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তীর টেনে বের করলেন। হযরত আলী (রা.) গভীর মনযোগ সহ দীর্ঘসময় নিয়ে নামায সম্পন্ন করে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তীর বের করতে এসেছ? তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা আপনার শরীর থেকে তীর নামাযে থাকা অবস্থায় বের করে ফেলেছি। বিস্মিত আলী (রা.) পায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কিন্তু কোনক্রমেই বুঝতেই পারলাম না তা কখন তোমরা বের করেছ।

আল্লাহ্ ভরসার সুফল

হযরত আবুযর গিফারী (রা.) জঙ্গলে বাস করতেন। এক সময় তাঁর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এল। তাঁর বাড়ির আশপাশে আর কোন ঘর বা মানুষ ছিল না। কেবলমাত্র হজ্বের সময়ে ইরাকের হাজীগণ তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে মক্কায় যেতেন। তখন হজ্বের মৌসুমও ছিল না। ঘরে তাঁর স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ ছিল না। এমতাবস্থায় মৃত্যু হলে কে দাফন করবে, গোসল করাবে কে, জানাযা পড়াবে কে, কে কবর খনন করবে? স্ত্রী বলল, এখন আমাদের কি হবে? আপনার এ অবস্থায় আমরা কি করব? তখন আবুযর (রা.) বললেন, না তোমাদের সাথে মিথ্যা বলব, আর না আমার সাথে মিথ্যা বলা হয়েছে। আমি এক মাহফিলে বসেছিলাম, আমার মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মাঝে এক ব্যক্তি এমন যে, সে একাকীই মারা যাবে, একাকী থাকবে, একাকী চলাফেরা করবে এবং মুসলমানদের একদল তাঁর জানাযা পড়বে। এ মাহফিলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই শহরে মারা গিয়েছেন, আমি একাকী জঙ্গলে

বেঁচে আছি। জানিনা, কারা আসবে কোথা থেকে আসবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খবর পুরোপুরি সত্য। সুতরাং দুর্ভাবনা করবে না, আমার জানাযা পড়তে কেউ না কেউ অবশ্যই আসবে। তাকওয়ার কারণে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম পূর্ণরূপেই তাঁর মন মস্তিস্কে আসন গেড়ে বসেছিল। আপনি বাজারের দোকানীর কাছে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ্‌র দ্বীনের নির্দেশনা কি? এ তেজারত সম্পর্কে তোমার পূর্ণ ধারণা আছে তো? কোন তরীকায় কারবার করলে আল্লাহ্‌র হাবীব নারায হবেন না তা কি তুমি জান? কেউ উত্তর দিতে পারবে না। জমিদারের কাছে জিজ্ঞেস করুন, ভাই! জমিদারী কিরূপে করতে হবে? যাতে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারাযীর স্থলে রাযী হয়ে যান। ব্যবসায়ীর ন্যায় জমিদারও মিথ্যা বলছে, সুদ খাচ্ছে-দিচ্ছে। কিন্তু আবুযর গিফারী (রা.) প্রচণ্ড অসুস্থাবস্থায় একদিন দুইদিন তিনদিন, বিছানায় থাকার পর মুমূর্ষ অবস্থায় মেয়েকে ডেকে বললেন, আজ অবশ্যই মেহমান আসবে আমার জানাযা পড়ার জন্য। তুমি খাবার তৈরী কর, যেন মেহমানদের কোন কষ্ট না হয় আজ অবশ্যই আমার মৃত্যু হবে। তাকে বিদায় দিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললেন তুমি পথের পাশে প্রতীক্ষায় থাক, কেউ না কেউ অবশ্যই আসবে। নির্দেশ মোতাবেক স্ত্রী পথের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আল্লাহ্ আকবার! কিছুক্ষণ পরেই তাঁর আশা নিরাশার দোদূল্য দূর হয়ে গেল। তিনি দেখলেন ইরাক সীমান্তের রাস্তায় ধুলি উড়ছে। ধুলা বালু পরিস্কার হওয়ার পর বিশটি উটে আরোহী দেখতে পেলেন। আবুযর (রা.)-এর স্ত্রী পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে থামার জন্য ইশারা করলেন। পথচারীগণ রাস্তার ধারে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের উটের গতিপথ ঘুরিয়ে দিলেন। অবস্থাদৃষ্টে অসহায় মহিলা। তিনি আওয়ায দিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র এক বান্দা মারা যাচ্ছেন, তাঁর জানাযা পড়ে তোমরা পূণ্য লাভ করতে পার। একজন জানতে চাইল, তিনি কে? বললেন, আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয়সাথী আবুযর গিফারী (রা.)। নাম শোনামাত্র কাফেলার সকলে উচ্চস্বরে কান্না জুড়ে বললেন, আমাদের পিতা-মাতা আবুযর গিফারী (রা.)-এর জন্য কোরবান হোক। তাঁরা ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের নেতৃত্বাধীন কাফেলা।

আর এভাবেই আল্লাহ্‌র রাসূলের বাণীর যথার্থতা হযরত আবু যর (রা.)-এর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

হযরত হুদ (আ.) এর কওমের অবাধ্যতার পরিণাম

হযরত হুদ (আ.)এমন এক কওমের মাঝে এসেছেন যাদের ব্যাপারে তাফসীরে ইবনে কাসীরে লেখা রয়েছে তাদের সন্তানেরা তিনশত বছরে বালেগ হত এবং তাদের বয়স হাজার বছর হত আর একেকজনের উচ্চতা ছিল ত্রিশ কিংবা চল্লিশ হাত। তাদের সাথে হুদ (আ.)-এর মোকাবিলা হল। হুদ (আ.) বললেন, তোমরা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর স্বীকৃতি দাও। অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা উত্তরে বলল, এমন কে আছে যে, আমাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী? দাওয়াত চলতে লাগল, ততধিক গতিতে হুদ (আ.) এর বিরোধিতাও হতে থাকল।

একথাটি মনে রাখবেন, দাওয়াত দাতা হিসেবে কেউ আসার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সুযোগ দেন, যখন দাওয়াত দাতা এসে পড়ে তখন সুযোগের সময়সীমা সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এরপর হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত দান করেন কিংবা ধ্বংস করে দেন। এভাবেই কওমে হুদের মাঝে সহসা দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ক্ষুধার তাড়নায় তারা সবকিছুই খেয়ে ফেলল। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, গাছের পাতা কোন কিছুই তাদের হাত থেকে রক্ষা পেল না। খাবারের মত কোন কিছু না পেয়ে এক সময় তারা হুদ (আ.)-এর কাছে এসে বলল, আমরা এখন কি করব? আপনি বলে দিন। হুদ (আ.) বললেন আমার রবের সামনে মাথা অবনত কর এবং ইসতিগফার পড়। আমি তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছি, আমার রবকে স্রষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দাও, তোমাদের কল্যাণ হবে, তোমরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারা বলল, তা কোন ক্রমেই হতে পারে না। প্রত্যুত্তরে হুদ (আ.) বললেন, তাহলে তোমরা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুতি নাও। তারা পরামর্শ করে একদল লোককে বাইতুল্লাহ শরীফে নাজাতের দোআর জন্য পাঠিয়ে দিল।

আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি মেঘখন্ড প্রস্তুত করলেন। একটি কাল, দ্বিতীয়টি সাদা এবং তৃতীয়টি লাল। এরপর প্রতিনিধি দলকে বললেন, এ তিনটির মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নাও। তারা আলোচনা করল

লাল এবং সাদা মেঘমালায় পানি থাকে না, কাল মেঘেই পানি থাকে, তারা ফরিয়াদ জানাল, আমাদেরকে কাল মেঘ দান করুন এর মাধ্যমেই আমরা বৃষ্টি লাভ করব। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, ঠিক আছে।

ইরশাদ হয়েছে—

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ـ

আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, যাও! তোমাদের পিছনে পিছনে মেঘমালাও যাচ্ছে। যখন তারা নিজ নিজ গৃহে পৌঁছল এবং মেঘমালাও তাদের লোকালয়ের উপর অবস্থান নিল, আচমকা মেঘের ভেতর থেকে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় শুরু হল, আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন হাওয়ার ভাণ্ডারে ছিদ্র কর এবং এ কওমকে ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতা আরয করল, হে আল্লাহ্! কতগুলো ছিদ্র করব? গাভীর নাকের ছিদ্রের অনুরূপ ছিদ্র করব? আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, অতগুলো ছিদ্র করলে পুরো পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যাবে, আংটির সমপরিমাণ ছিদ্র কর। নির্দেশানুসারে ফেরেশতা বাতাসে ছিদ্র করল, সঙ্গে সঙ্গে এমন তীব্র বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ করল যে, হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনায় বাতাস পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতার হাত থেকে بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ বাতাস অবাধ্য হয়ে গেল। এর ব্যখ্যায় হযরত আলী (রা.) বলেন, সে বাতাসের নিয়ন্ত্রণভার ফেরেশতার হাত থেকে ছুটে গেল, ফেরেশতা কোন ভাবেই বাতাসকে কাবু করতে পারল না। আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ নির্দেশে হাওয়া চলতে শুরু করল, বাতাস প্রচণ্ড বেগে কওমে হুদের উপর দিয়ে বয়ে চলল। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বসতির লোকদেরকে খড়কুটার ন্যায় উড়িয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে আছড়ে ফেলল, এতে মাথার মগজ হাওয়ায় উড়ল, হাত-পা-মাথা চারদিকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল, ঘরবাড়ি বালুকণার সাথে মিশে গেল। সবকিছু ধ্বংস করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত বিশ্ববাসীর সামনে কওমে হুদকে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরেছেন। এটা কালিমার ক্ষমতার কারণেই তা করা হয়েছে।

রাসূলের প্রেমে নিবেদিত প্রাণ

জনৈক আনসারী মহিলা খবর পেল ওহুদ যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এ খবর শুনামাত্রই পাগলনীর ন্যায় অস্থির হয়ে সে মদীনা থেকে বের হয়ে পড়ল। তখনও পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। পর্দার বিধান আসে ৫ম হিজরীতে। আর ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৩য় হিজরীতে। সে মহিলা ব্যাকুল হয়ে বলতেছিল, مَاذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ مَاذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ এক ব্যক্তি সামনে এসে বলতে লাগল قتل زوجك হযরত আমার বিন জামু (রা.)-এর বিবি এ সংবাদ দিল قُتِلَ زَوْجُكَ তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছেন। একথা শুনে সে শুধু বলল—اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ مَاذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ আগে বল আল্লাহ্র রাসূলের কি খবর? সে আবার বলল তোমার ছেলে শহীদ হয়ে গেছে, সে পূর্বের ন্যায় বলল :

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ مَاذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

আল্লাহ্র রাসূলের কি অবস্থা? সে আবার বলল তোমার ভাই শহীদ হয়ে গেছে, তখন আনসারী মহিলা (রা.) শুধু اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলে পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞেস করল আল্লাহ্র রাসূলের কি অবস্থা তা বল, মহিলার স্বামী, সন্তান, ভাই সবাই শহীদ হয়ে গেল। তাঁর পিছনে দাঁড়ানোর মত পৃথিবীতে আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। অথচ রাসূলের মহব্বত তাঁর মধ্যে এতই প্রবল যে, সে গুলোর প্রতি খেয়াল করার সময় তাঁর নেই। পরিশেষে তাঁকে বলা হল রাসূল (সা) ভাল আছেন। حَتّٰى تَقَرَّ عَيْنِيْ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে নয়ন না জুড়ানো পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই বলে সে ওহুদ পানে ছুটে চলল। সেখানে পৌঁছে সে রাসূলকে সামনে থেকে আসতে দেখে রাসূলের সামনে বসে পড়ল এবং নবীজির জামার হাতল ধরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোটা পৃথিবী ধ্বংস হলেও কোন দুঃখ নেই। আপনি জীবিত আছেন এতেই আমি আনন্দিত।

হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর মর্যাদা

খ-কের যুদ্ধের সময়কালে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ল। কেননা তিনি ছিলেন ইরানী আর আরবরা ছিল শ্রেষ্ঠ

বংশের। তাই তাদের বংশ গৌরব ছিল সবসময় এবং থাকারও কথা। কেননা তারা ছিল আরবের সকল গোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোত্রের লোক। সেসব গোত্রের মধ্যে আবার কুরাইশ ছিল সর্বশীর্ষে। তাদের মধ্যে আরো মর্যাদাশালী ছিল বনু আবদে মানাফ। বনু আবদে মানাফের মধ্যে আবার বনু আব্দিল মুত্তালিব ছিল আরো সম্মানিত। তাদের মধ্যে আবার বনু হাশিম ছিল সর্বশীর্ষে। সে বনু হাশেমেই জন্ম নিয়েছিলেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে আল্লাহ্ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রেই পাঠিয়েছেন।

হযরত সালমান ফারসী ছিলেন ইরানী। কিন্তু ঈমান আমল, উৎসাহ-উদ্দীপনায় তিনি এমন স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন যে, খন্দক খনন করার সময় যখন কিছু অংশ মুহাজিরদের মধ্যে আর কিছু অংশ আনসারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হল, তখন বিতর্ক শুরু হল হযরত সালমান ফারসীকে নিয়ে। তিনি কোন দিকে যাবেন। মুহাজিরদের সাথে নাকি আনসারদের সাথে। আনসাররা বলল, সালমান মদীনায় আছেন আমাদের সাথে থাকেন। কাজেই তিনি আমাদের সাথে অংশ নিবেন। মুহাজিররা বলল, তিনি হিযরত করে এসেছেন তাই আমাদের সাথেই থাকবেন। কথায় কথা বাড়তে বাড়তে যখন বিবাদের দিকে ধাবিত হতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হয়ে ফয়সালা দিলেন سَلْمَانُ مِنَّا مِنْ اَہْلِ الْبَيْتِ অর্থাৎ সালমান মুহাজিরদের সাথেও না, আনসারদের সাথেও না বরং সালমান আমার আহলে বাইতের সাথে। এখানে চিন্তার বিষয় রয়েছে। তিনি পারস্যের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও কোন কারণে আহলে বাইত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন? সেটা হচ্ছে ঈমান এবং তাকওয়ার বদৌলতে। অথচ আবু লাহাবও সায়্যিদ ছিল। কিন্তু সে হল জাহান্নামী।

জনৈক বেদুঈনের প্রতি নবীজীর উপদেশ

নবীজীর খিদমতে এক বেদুঈন হাজির হয়ে আরজ করল,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বড় আলেম হতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- اِتَّقِ اللّٰهَ تَكُنْ اَعْلَمَ النَّاسِ তুমি তাকওয়া অবলম্বন করলে সবচেয়ে বড় আলেম হবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি

সবচেয়ে বড় সম্পদশালী হতে চাই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কানাআত তথা অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন কর, বড় সম্পদশালী হয়ে যাবে। সে বলল, আমি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকর কর, তাহলে তিনি তোমাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করবেন। সে বলল, আমি সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হতে চাই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজের প্রয়োজনের কথা আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া আর কারো কাছে ব্যক্ত করবে না। আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে সকলের চেয়ে বেশী সম্মান দান করবেন। সে আবার বলল, আমি চাই আমার রিযক বেশী হয়ে যাক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবসময় উযূর সাথে থাক, তোমার রিযকে বরকত হবে। সে বলল, আমি চাই আমার আল্লাহ্ যেন আমাকে বেইজ্জত না করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যিনা-ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাক, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে সব ধরনের যিল্লতি থেকে রক্ষা করবেন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি চাই আমার ঈমান কামেল ও পরিপূর্ণ হোক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার আখলাক ভাল কর। উত্তম আখলাক অর্জন করা ছাড়া পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। ঈমান শেখা ফরয, ইবাদত করা ফরয, আখলাক হাসিল করা ফরয, ইখলাস অর্জন করা ফরয।

নবীজীর দুআয় মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত

হযরত উম্মে সাআদ (রা.)-এর ছেলে মারা গেল। ছেলের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি এসে হাজির হলেন। গোসল দেয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, তিনি এসে মায়্যিতের পায়ের দিকে বসলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে কিছু না বলে মনে মনে দুআ করলেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার মহব্বতে কালেমা পড়েছি, ঘর ছেড়েছি, তোমার হাবীবের ঘরে এসেছি। আর আমার এ ছেলেকে তুমি তুলে নিলে! হে আল্লাহ্ দুশমনকে আমার উপর হাসাবেন না। তারা বলবে, বাপ দাদার ধর্ম ছেড়েছ তাই তার ছেলে মারা গেছে। হে আল্লাহ্! তুমি দুশমনদেরকে হাসার সুযোগ দিও না। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম, উম্মে সাআদের দুআ শেষ হওয়ার আগেই মায়্যিত নাড়াচাড়া করে কাফনের কাপড় খুলে উঠে বসল।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রহ.)-এর বিস্ময় কাহিনী

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রহ) একবার হজ্বে যাওয়ার সময় ঘোষণা করলেন, আমি হজ্বে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য কে কে তৈরী আছেন। ঘোষণা শুনে হাজারো লোক তৈরী হল। তিনি বললেন, আমার সাথে সেসব লোক সফর করতে পারবে যারা নিজেদের সাথে টাকা-পয়সা, খানা-পিনা কিছুই নিতে পারবে না। সম্পূর্ণ খালি হাত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল তাহলে খানাপিনার কি হবে? তিনি বললেন, যার মেহমান তাঁর কাছে থেকেই চেয়ে নেব। একথা শুনে অনেকেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল, মাত্র কয়েকশত লোক যাওয়ার জন্য অবশিষ্ট রইল। তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। চলতে চলতে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সওয়ারীও ক্লান্ত। সাথিরা বলল, আবু মুসলিম খাওয়ার ব্যবস্থা কর। আমরাও ক্ষুধার্থ আর আমাদের সওয়ারীও ক্ষুধার্থ। আবু মুসলিম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের শেষে হাটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলেন যে, হে আল্লাহ্! এতগুলো মানুষ যদি কোন কৃপণের কাছে যেয়ে হাত পাতে তাহলে সেও লজ্জায় দাতা হয়ে যাবে। আর আপনি দাতার দাতা। আমরা আপনার ঘরে যাচ্ছি। আপনার উপর ভরসা করে বের হয়েছি। আমরা আপনার মেহমান। বনী ইসরাইলকে আপনি মান্না-সালওয়া খাইয়েছিলেন, আমাদেরকেও তা দান করুন। তাঁর হাত নামানোর আগেই দেখা গেল তার তাঁবুতে খানার দস্তরখানা বিছানো রয়েছে এবং পশুদের খাদ্যের স্তুপ জমা হয়ে আছে। তিনি সকলকে ডেকে দস্তরখানায় শরীক করলেন। খাওয়া দাওয়ার শেষে কিছু বেঁচে গেলে সাথিরা বলল, পরবর্তী সময়ের জন্য এগুলো রেখে দেই? আবু মুসলিম বললেন, যিনি এখন খাইয়েছেন, পরের ওয়াক্তেও তিনিই গরম আর টাটকা খানা খাওয়াবেন। এভাবেই তাঁরা সারা সফর সম্পন্ন করলেন।

এ আবু মুসলিমই একবার তিন হাজার মুসলিম বাহিনী নিয়ে সিরিয়ায় পৌছলেন। সামনে একটি দরিয়া পড়ল। পার হওয়ার জন্য ছিল না কোন কিছুই, অথচ দরিয়া পার না হলেই নয়। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দুই রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ্! তুমি বনী ইসরাইলের জন্য দরিয়ার মধ্যে রাস্তা করে দিয়েছিলে এখন তোমার হাবীবের উম্মতদের জন্য রাস্তা করে দাও। এর

পরে সাথিদেরকে ডেকে বললেন, আমার সাথে সকলে দরিয়ার মধ্যে নেমে পড়। কারো মাল-জান বিনষ্ট হলে এর যিম্মাদার আমি। এরপর তিনি নিজের ঘোড়া পানিতে নামিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ তাআলা পানিকে তাদের অনুগত করে দিলেন। নদীর পানি ছিল পাহাড়ী ঢল, পাথর পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু তিন হাজার সেনাবাহিনী নির্বিঘ্নে দরিয়া পার হয়ে গেল। একজন ইচ্ছা করে নিজের পেয়ালাটা দরিয়ার মধ্যে ফেলে দিল। অপর পাড়ে সকলে চলে যাওয়ার পর আবু মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, কারো কোন জিনিষ বিনষ্ট হয়ে থাকলে বলতে পার, তখন এ ব্যক্তি বলল, আমার পেয়ালা দরিয়ায় ডুবে গেছে। যেখান থেকে তারা দরিয়া পার হয়েছিলেন সেখানে যেয়ে দেখেন পেয়ালা সেখানেই পড়ে রয়েছে।

হে আমার ভাইয়েরা! এরকম সম্পর্ক আমাদেরও আল্লাহ্‌র সাথে কায়েম করতে হবে। আর এটা এমন কঠিন কিছু নয়। অত্যন্ত সহজ বিষয়। এজন্য সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে তাওবা করা। নিজের গোনাহর কথা স্মরণ করে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমার আবেদন-নিবেদন করতে হবে। এতেই আশা করা যায় আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতপ্রীতি

তায়েফের প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে তিন মাইল রাস্তা দৌড়ালেন। সারা জগতের শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ তায়ালার হাবীব আল্লাহ্‌র মাহবুব, যমীন ও আসমানে যাঁর নবুওয়াতের চর্চা জারী, যার নবুওয়াত সম্পর্কে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছে। তিনি তিন মাইল দৌড়ালেন, তাঁর কষ্টে ফেরেশতারাও ক্রন্দনরত। যে মাটিতে তাঁর শরীরের রক্ত ঝরছিল সে মাটিও কাঁদছিল, তায়েফের পাহাড় কাঁদছিল, জল-স্থলের মাখলুক কাঁদছিল। এত কষ্ট আর নির্যাতন হল আল্লাহ্‌র হাবীবের উপর। এত অত্যাচারের পরেও যখন ফেরেশতা এসে বলল যে, আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি তায়েফের এ দুই পাহাড়ের মধ্যে পিষে এদেরকে মেরে ফেলতে পারি। তখন দয়ার সাগর রাহমাতুল লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এরা মুসলমান না হলেও এদের সন্তান-সন্ততিরা মুসলমান হতে পারে।

ওহুদের যুদ্ধের সময় কাফেররা নবীজীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। আবদুল্লাহ ইবনে মায়সামাহ নবীজীর উপর তরবারী দ্বারা আঘাত করলে লৌহ শিরস্ত্রানের কড়া ভেঙ্গে চেহারায় ঢুকে গেল। হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর ভাই ছিল উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস, যে কিনা কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছিল, সে নবীজীর উপর পাথর ছুঁড়ে মারল। এ পাথর এসে আঘাত করল নবীজীর মুখে। এতে নবীজীর দাঁত মুবারক শহীদ হয়ে গেল। তিনি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরক্ষণে যখন হুশ ফিরে এল তখন বদ দুআর পরিবর্তে তাঁর মুখে ছিল স্বীয় কওমের হিফাযতের দুআ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ হে আল্লাহ্ আমার কওমকে ধ্বংস করবেন না, তাদের হিদায়াত দান কর। তারা জানে না, জানলে আমাকে অবশ্যই কষ্ট দিত না। এ হচ্ছে উম্মতের জন্য নবীজীর দয়া আর দরদ।

আল্লাহ্‌র কুদরতের নমুনা

এক সাহাবীর ঘটনা। তিনি বাড়িতে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন খানা পিনার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, না। ক্ষুধায় ক্লান্ত, ঘরে খাবার নেই, কি আর করবেন, বাইরে বের হয়ে গেলেন। স্ত্রী চিন্তা করলেন তিনি তো বাইরে চলে গেলেন। কিন্তু আমার অভুক্ত অবস্থা আমি কিভাবে গোপন করব। আমার ঘরে যে কিছুই নেই তা আমি প্রতিবেশীদের নিকটই বা কিভাবে লুকাব!! অগত্যা তিনি চুলা ধরালেন যাতে আশপাশের লোকেরা জানতে পারে যে, সে বাড়ীতে রান্না হচ্ছে, খানার ইন্তিজাম আছে। এরপর খালি যাতা ঘুরাতে শুরু করলেন যাতে প্রতিবেশীরা জানতে পারে যে, সে বাড়ীতে আটা পেষা হচ্ছে। এভাবে নিজেদের অভুক্ত থাকার কথা গোপন করতে চেষ্টা করলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দুআও করলেন যে, আপনি আমাদের জন্য রিযকের ব্যবস্থা করে দিন। শুধু মাত্র একটা শব্দ দরদের সাথে মুখ দিয়ে বের হয়েছিল "ইয়া আল্লাহ্!" আমাদেরকে রিযক দিন। দুআর শব্দ শেষ হওয়ার আগেই চুলা থেকে সুঘ্রাণ আসতে শুরু করল। ইতিমধ্যে স্বামীও এসে উপস্থিত হল। দুজনে চুলার মধ্যে উ'কি দিয়ে দেখে রান ভুনা হচ্ছে, এরই সুঘ্রাণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে যাতা ঘুরতে শুরু করেছে আর সেখান থেকে আটা বের হচ্ছে।

যত পাত্র ছিল সব আটা দিয়ে ভরে নিল। কিন্তু যখন যাতা উঠিয়ে দেখতে গেল তখন আর কিছুই পাওয়া গেল না। নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন, তোমারা যদি যাতা উঠিয়ে দেখতে না যেতে তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত এটা ঘুরতে থাকত।

জনৈক বেদুঈনের তিনটি প্রশ্ন

একবার এক বেদুইন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে এসে তিনটি প্রশ্ন উথাপন করল। প্রথম হল, আমরা আমাদের বাপ-দাদার দ্বীন ছেড়ে আপনার দ্বীন গ্রহণ করব, এটা কিভাবে সম্ভব। দ্বিতীয় হল, আপনি বলছেন, কায়সার আর কিসরা আমাদের গোলাম হয়ে যাবে। অথচ আমাদের অবস্থা এমনই যে, আমরা খাওয়ার জন্য রুটিও পাইনা, তাহলে তারা কিভাবে আমাদের গোলাম হয়ে যাবে? আর তৃতীয় হল, মৃত্যুর পরে আমরা যখন পঁচে গলে মাটি হয়ে যাব তখন আবার কিভাবে আমাদেরকে জীবিত করা হবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে হায়াত দিলে তুমি দেখতে পাবে যে, সারা আরব যদি আমার কালেমা পড়ে তাহলে তাদের হাতে পারস্য আর রোম বিজিত হবে। আর তৃতীয় বিষয় যেটি, সেটি কিয়ামতের দিন তুমি বুঝতে পারবে। আমি সেদিন তোমার হাত ধরে তোমার একথা স্মরণ করিয়ে দেব। সে বলল, আমি এরকম বেহুদা কথায় বিশ্বাস করি না। এ বলে সে চলে গেল। তার জীবদ্দশায় মক্কা বিজয় হল, তাবুক পর্যন্ত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু তবুও সে মুসলমান হল না। তার পরে কাদেসিয়ার যুদ্ধ হল, ইরান বিজয় হল, ইয়ারমুকের যুদ্ধের পরে রোমও পদানত হল, তখন তার মনে ভয়ের সঞ্চার হল। সে হিযরত করে মদীনায় এসে মুসলমান হয়ে গেল। যখন সে মসজিদে নববীতে এসে প্রবেশ করল তখন হযরত উমর (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে ইস্তিকবাল করলেন, এরপর উপস্থিত সাহাবীদের কে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা কি জানেন ইনি কে? ইনি হলেন সে ব্যক্তি, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমি কিয়ামতের দিন তোমার হাত ধরে মনে করিয়ে দেব। আর যার হাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরবেন তাকে জান্নাতে না পৌছে ছাড়বেন না। এ ব্যক্তিই খাঁটি জান্নাতী।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের কাহিনী

মুহাম্মদ বিন কাসিম (রহ) যাঁর মাধ্যমে সিন্ধু আর পাঞ্জাবের লোকেরা ইসলাম পেয়েছে। তাঁর বিবাহ হয়েছিল মাত্র চার মাস আগে। তাঁর চাচা ছিল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তিনি নিজের কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সাথে। বিবাহের চার মাস পরেই তিনি জামাতাকে পাঠিয়ে দিলেন সিন্ধু অভিযানের সেনাপতি করে। সোয়া দুই বছর তিনি সিন্ধুতে ছিলেন। আজও মুসলমানদের আমলের একটা অংশ তাঁর আমলনামায় যোগ হচ্ছে। আড়াই বছরের মাথায় উমাইয়া খলীফা সুলাইমানের নির্দেশে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং সুলাইমানের নির্যাতনের শিকার হয়ে তিনি জেলখানায় শাহাদাত বরণ করেন। নিজের ঘরকে তিনি মাত্র চার মাস আবাদ দেখতে পেয়েছিলেন। এরপর চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের হিদায়াতের সওয়াব নিজের আমল নামায় লেখানোর ব্যবস্থা করে গেছেন। এখনও সেই লেখার ধারা জারী আছে। যখন তাকে শহীদ করা হচ্ছিল তখন তিনি বলছিলেন– তারা আমাকে নিশ্চিহ্ন করছে, কিন্তু কেমন যুবককে নিশ্চিহ্ন করছে তা কি তারা জানে? তো এক মুহাম্মাদ বিন কাসিমের ঘর বিরান হয়ে কোটি মানুষের ঘর আবাদ হয়েছে।

এক শাহাদতপ্রাপ্ত সাহাবীর বীরত্বের কাহিনী

হযরত সাআদ (রা.) ছিলেন একজন যুবক সাহাবী। তাঁর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল। এমন সময় জিহাদের দামামা বেজে উঠল। তিনি ময়দানের দিকে ছুটলেন। তাঁর মুখ ছিল ঢাকা, সম্ভবত এ জন্যই যে, নবীজী দেখলে আবার ফিরিয়ে দেন কি না। প্রচন্ডভাবে লড়াই শুরু হল। তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে, তাঁর ঘোড়ার গায়ে তীর বিদ্ধ হলে তিনি পড়ে গেলেন এবং ঘোড়াও। তাড়াতাড়ি উঠে হাতা গুটিয়ে বাহু উর্দ্ধে তুলে ধরলেন। এমন সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি সাআদকে দেখে, বললেন আরে তুমি না বিবাহ করতে যাচ্ছিলে? তিনি বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমি সাআদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ। তুমি কামিয়াব

হয়ে গেছ। জান্নাতের সুসংবাদ পেতেই তিনি এক লাফে গিয়ে পড়লেন কাফেরদের মধ্যে আর বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। নবীজীকে সংবাদ দেয়া হল যে, সাআদ শহীদ হয়ে গেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা নিজের কোলে তুলে নিলেন। চোখ থেকে অশ্রুর ফোঁটা ঝরে ঝরে হযরত সাআদের চেহারার মাটি ও রক্ত ধুয়ে যেতে লাগল। ক্রন্দনরত অবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাআদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কত প্রিয় পাত্র হয়ে গেল"।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, সাআদ হাউজে পৌঁছে গেছে। হযরত আবু লুবাবা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাউজ কি জিনিষ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার রব আমাকে দিয়েছেন, যার পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি, আর বরফের চেয়ে শীতল, দুধের চেয়ে সাদা। এক ঢোক পান করলে আর কখনো পিপাসা লাগবে না। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি প্রথমে কাঁদছিলেন, পরে আবার মুচকি হাসলেন। এরপর চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন, এর কারণ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাআদের বিরহে আমি কাঁদছিলাম আর জান্নাতের মধ্যে তাঁর মর্যাদা দেখে হাসলাম। জান্নাতের খুবসরত স্ত্রীদেরকে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখে আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। তাঁরা দৌড়ের মধ্যে পাল্লা দিচ্ছিল, একজন বলছিল আমি আগে পৌঁছুব, অন্যজন বলছিল, না আমি তোমার আগে পৌঁছুব। দ্রুত দৌড়ানোর কারণে তাঁদের পায়ের গোছা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল আর তাঁদের পায়ের নূপুর দেখা যাচ্ছিল, তাই আমি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম"।

তালুত ও জালুতের কাহিনী

যখন হযরত দাউদ (আ.) ছোট বাচ্চা ছিলেন তখন তালুত জালুতের মোকাবিলার জন্য বের হয়েছিলেন তখন তারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাস্তার পাশে একটি পাথর পড়ে থাকতে দেখলেন। পাথরটি বলল, হে দাউদ! আমাকেও সাথে নিয়ে যাও, কেননা আমার মধ্যে জালুতের মৃত্যু পরওয়ানা লেখা আছে। ছোট একটি পাথর তাই সেটি উঠিয়ে তিনি জামার

পকেটে রেখে দিলেন। যুদ্ধের ময়দানে হাজির হল জালুত লৌহ বর্ম. লৌহ শিরস্ত্রান ইত্যাদি পরিধান করে। তার শুধুমাত্র চোখ দুটি দেখা যাচ্ছিল। ময়দানে এসেই সে হুংকার ছাড়ল কে আছ আমার সাথে মুকাবিলার জন্য চলে এস। হযরত দাউদ (আ.) তালুত কে বললেন, তার মুকাবিলার জন্য আমি যাচ্ছি। তালুত অনুমতি দিলে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হলেন। জালুত দর্পভরে বলল, দুধের এ শিশু আমার মুকাবিলায় এসেছ মৃত্যুর সাথে খেলা করতে। এমন সময় হযরত দাউদ (আ.) পকেট থেকে সে পাথরটি বের করে তার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলেন, পাথর মাথার এপার থেকে ঢুকে ওপারে বের হয়ে গেল। এখানেই শেষ হয়ে গেল জালুতের অহংকার।

স্বামীর নির্দেশ পালনের প্রতিদান

এক মহিলার স্বামী আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে গেল সব সময় ঘরেই থাকবে, বাইরে বের হবে না। ঘটনাক্রমে তার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়ল। মহিলা নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হল মাসআলা জানার জন্য যে, আমার স্বামী তো এরকম বলে গেছেন। এখন আমি কি করব? মহিলার স্বামীর অবশ্য এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, পিতার কাছেও যেতে পারবেনা, কিন্তু তার মুখ দিয়ে যেহেতু কথাটি বেরিয়েছিল তাই মহিলা কথাটির মর্যাদা রক্ষা করল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্বামী যখন বলে গেছে তখন তো ঘরেই থাকতে হবে।

এরপর তার পিতার যখন অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল, তখন এ মহিলা আবার জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি এখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু হয়ে গেল। এবার মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ তার মুখ দেখার জন্য কি যেতে পারব? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘরেই থাক। মহিলা এ নির্দেশও হাসিমুখে মেনে নিলেন। হা-হুতাশ করলেন না। মাতম করলেন না, মুখ দেখতে গেলেন না, স্বামীর নির্দেশ ভঙ্গ করলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাফন কাফন শেষ করে ফেরার পথে এ মহিলাকে ডেকে বললেন– তোমার সবরের কারণে আল্লাহ্‌ তোমার পিতাকে জান্নাত নসীব করেছেন।

জনৈক আনসারী সাহাবী ও তাঁর মায়ের কাহিনী

এক আনসারী সাহাবী তাঁর মাকে বললেন, আমাকে আল্লাহ্‌র জন্য ওয়াকফ করে দিন। মা বললেন, যাও তোমাকে ওয়াকফ করে দিলাম। এ সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে ১৯ বছর পর বাড়িতে ফিরে এলেন। যখন ফিরে এলেন তখন ছিল রাত। দরজায় করাঘাত করলে মা বললেন, কে? সাহাবী বললেন, আমি আপনার ছেলে। মা বললেন, আমি তো তোমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছি। আর ওয়াকফ কৃত জিনিষ ফেরত নেয়া বড় লজ্জার কথা। চলে যাও কিয়ামতের দিন সাক্ষাত হবে। মা দরজা খুললেন না। এ আত্মত্যাগের কারণে সে ছেলে কত বড় মর্যাদা লাভ করলেন। খলীফা আবু জাফর মনসুরের বিরুদ্ধে সে ছেলে ফতওয়া দিয়ে ছিলেন। আবু জাফর আদেশ জারি করলেন যে, আমি মক্কায় আসছি, ফাঁসির মঞ্চ তৈরী কর, তাকে আমার সামনে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। হাতীমে কাবায় তিনি ফুজায়েল ইবনে আয়াজের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমন সময় সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না এসে বললেন, সুফিয়ান সাওরী উঠে পালিয়ে যাও। আবু জাফর তোমাকে ফাঁসিতে লটকানোর নির্দেশ জারি করেছেন। তিনি উঠে সোজা মুলতাযামে এসে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ্‌! তুমি যদি আবু জাফরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দাও তাহলে কিন্তু এ বন্ধুত্ব আর থাকবে না। তাঁর এ আবেদন আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল সে কারণে আবু জাফর মক্কা পৌছা তো দুরে থাক তায়েফে আসার আগেই একটা পাহাড়ে টক্কর খেয়ে মৃত্যুবরণ করল।

হযরত আযরাইল (আ.)-এর দয়া

হযরত আযরাঈল (আ.)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কত লোকের জান কবজ করেছ, কিন্তু কখনো কি কারো উপর তোমার দয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, দুইবার হয়েছিল। একবার এক মহিলা নৌকায় সফর করছিল, মাঝ নদীতে সে নৌকা দুই টুকরা হয়ে যায়। এ দুর্যোগময় অবস্থায় সে মহিলা একটা তক্তায় কোন রকমে আশ্রয় নেয়, আর তখনই তার শুরু হল প্রসব বেদনা এবং একটা বাচ্চা জন্ম হল। এমন সময় আপনার হুকুম হল সে মহিলার জান কবজ করার। এ নাজুক পরিস্থিতিতে তখন আমার বড়ই দয়া হল যে এ বাচ্চার কি হবে!

আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে, শাদ্দাদ যখন তিনশত বছর ধরে তার শখের জান্নাত তৈরী করল, এরপর সেখানে প্রবেশ করার সময় যেই মাত্র এক কদম ভেতরে রাখল তখনই আপনার নির্দেশ এল তার জান কবজ করার। আমি তার জান্নাতের দরজায় তাকে ফেলে দিলাম। তখন আমার মনে কিছুটা দয়ার সঞ্চার হয়েছিল। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান এ শাদ্দাদ কে ছিল? ফেরেশতা বললেন, এ ব্যাপারে হে আমার মহান আল্লাহ আপনিই তা অবগত। সে অজানা জ্ঞান আমার নেই। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, এ হচ্ছে সে বদবখত যার মায়ের রূহ তুমি নৌকার সে তক্তার উপর কবজ করেছিলে।

এক লক্ষের পরিবর্তে পনের লক্ষ

হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত হাসান (রা.)-এর ভাতা নির্ধারিত ছিল। এক সময় আসতে বিলম্ব হলে তিনি অনেক সমস্যায় পড়ে গেলেন। তখন ধারণা করলেন পত্রযোগে স্মরণ করিয়ে দিবেন। এ উদ্দেশ্যে পত্র লেখার জন্য দোয়াত কলম আনালেন। পরে এ চিন্তা-ভাবনা বাদ দিলেন এবং কাগজ কলম মাথার কাছে রেখেই শুয়ে পড়লেন। তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে বললেন, হাসান! তুমি আহলে বাইত পরিবার ভুক্ত হয়ে তুমি মাখলুকের নিকট কেন চাও? উত্তরে হাসান (রা.) বললেন, কষ্ট হচ্ছিল তাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার আল্লাহ্র নিকট কেন চাওনা? তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি চাইব? নবীজি বললেন, চাও যে হে আল্লাহ্! আমার দিলে বিশ্বাস ভরে দাও মাখলুক থেকে আমার সকল আশা কেটে দাও। হে আল্লাহ্! তুমিই আমার মন-মস্তিষ্কে এসে যাও। সমস্ত মাখলুক থেকে আমার আশা যেন শেষ হয়ে যায়। হে আল্লাহ্! তাওয়াককুলের সে পর্যায় যা আমি আপন শক্তি বলে অর্জন করতে পারিনি, নিজ আশাও ধারণাও কায়িম করাতে সক্ষম হয়নি। আমার চাওয়াও সে পর্যন্ত পৌছায়নি। যা তুমি নিজ বান্দাদের কাউকে দিয়েছ আমাকেও সে তাওয়াককুল নসীব কর"। কত মহৎ এ দুআ! হে নবী পরিবারের! এ দুআ কর। কয়েক দিন পরেই এক লক্ষের পরিবর্তে পনের লক্ষ এসে গেছে।

খাঁটি তওবার একটি কাহিনী

বনী ইসরাঈলে এক যুবক ছিল প্রচন্ড ধরনের বদমাশ, শরাবী, জুয়াড়ী। শহরের লোকেরা তার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে শহর থেকে বের করে দিল। খারাপ লোককে যখন খারাপ বলা হয় তখন সে আরো খারাপ হয়ে যায়। নবীদের তরীকা হল খারাপ কে খারাপ না বলা। তাকে ভালবাসায় কাছে আন। এরপর তাকে বুঝাও। মানবতার ভাষা এটা নয় যে, তাকে অত্যাচার, উৎপীড়ন কর বরং তাকে মহব্বত করে কাছে টানতে হবে। নচেৎ হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে। হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহ) বলতেন, দ্বীনদার লোকেরা অনেক বেদ্বীনী ছড়াচ্ছে। যারা তাবলীগের কাজকে ঘৃণার চোখে দেখে তাদের থেকে এরা দূরে সরে যায়, এতে দুরত্ব আরো বেশী হয়ে যায়। অতএব দুরে সরে না গিয়ে ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের মন জয় করে কাছে আনতে হবে।

যখন লোকরো এ যুবককে শহর থেকে বের করে দিল। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে শহরের বাইরে যেয়ে নিজের আস্তানা গেড়ে বসল। সেখানে কোন সাথী সঙ্গী ছিল না, খাদ্য-পানীয় ছিল না। আস্তে আস্তে সব শেষ হয়ে গেল। তার শরীর ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। মৃত্যুর আলামত দেখা দিতে লাগল। সে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে, ডানে দেখল, বামে দেখল কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। এরপরে সে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলতে লাগল, হে আল্লাহ্! আমি যদি জানতাম যে, আমাকে আযাব দেয়ার দ্বারা তোমার রাজত্বে প্রবৃদ্ধি ঘটবে আর ক্ষমা করে দিলে তোমার রাজত্ব হ্রাস পাবে তাহলে হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতাম না। যদি আমাকে আযাব দেয়ার দ্বারা তোমার রাজত্বে প্রবৃদ্ধি না ঘটে-তাহলে আমাকে আযাব না দিয়ে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! কেউ আমার সাথি হয় নি, সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করেছে। হে আল্লাহ্! আমি মৃত্যুর মুখে তাওবা করছি, গোনাহ করতে করতে গোটা জীবনই কেটে গেছে। হে আল্লাহ্! সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করেছে, একমাত্র তুমিই আমাকে পরিত্যাগ কর না। একথা বলেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, অমুক জঙ্গলে আমার এক বন্ধু মৃত্যুবরণ করেছে। তুমি যেয়ে তাকে গোসল দাও, কাফন পরাও

এবং জানাযা পড়াও। আর সারা শহরে ঘোষণা করে দাও যে, যারা নিজেদের মাগফিরাত কামনা করে তারা যেন এ ব্যক্তির জানাযায় শরীক হয়। মূসা (আ.) ঘোষণা করে দিলেন। ঘোষণা শুনে শহরের লোকজন সকলেই ছুটল জঙ্গলের দিকে। সেখানে যেয়ে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। সে শরাবী, জুয়াড়ী, ডাকাত, বদমাশ মরে পড়ে আছে। লোকেরা মূসা (আ.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল। হে মূসা ঘটনা কি? একে তো আমরা শহর থেকে বের করে দিয়েছিলাম অথচ আল্লাহ্ তায়ালা একে নিজের বন্ধু বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন! হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ্! তোমার বান্দারা বলছে, এ ব্যক্তি তোমার দুশমন আর তুমি তাকে নিজের বন্ধু বলছ!! আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, তাদের কথাও ঠিক, আমার কথাও ঠিক। সে আমার দুশমনই ছিল। কিন্তু মৃত্যুর সময় সে দেখল যে, সে একা, তার ডানে বামে কেউ নেই, সকলেই পরিত্যাগ করেছে আর সে অবস্থায় যখন সে আমাকে স্মরণ করল, আমাকে ডাকল, তখন আমি তাকে তার গোনাহের কারণে নিঃস্ব একাকী অবস্থায় পাকড়াও করতে লজ্জাবোধ করলাম। সে তখন যদি আমার কাছে সমগ্র দুনিয়ার জন্য ক্ষমার আবেদন জানাত তাও আমি কবুল করতাম।

ঔষধে শেফা নেই, শেফা আল্লাহ্র হুকুমের মধ্যেই

একদা হযরত মূসা (আ.)-এর পেটে ব্যাথা হলে তিনি আল্লাহ্ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, রাইহানের পাতা জ্বাল দিয়ে খেয়ে নাও। রাইহান হচ্ছে ছোট একটি গাছ। মূসা (আ.) সেটিকে পিষে খেয়ে নিলেন, এতে পেটের ব্যাথা ভাল হয়ে গেল। কয়েক দিন পরে পুনরায় পেটে ব্যাথ্যা হলে এবার আল্লাহ্ তাআলার কাছে জিজ্ঞাসা না করেই তিনি রাইহানের পাতা পিষে খেয়ে নিলেন। কিন্তু এবার ব্যাথা ভাল না হয়ে আরো বেড়ে গেল। তখন মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ্! এ কি হল! মূসা (আ.) আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তাআলা বললেন, তুমি মনে করেছিলে এর মধ্যে শেফা রয়েছে তাই আমার কাছে জিজ্ঞাসা না করেই খেয়ে নিয়েছ। অথচ রাইহানের মধ্যে কোন শিফা বা আরোগ্য নেই। শিফা তো আমার হুকুমের মধ্যেই নিহিত।

এবার ভাবুন আল্লাহ্ ভরসাকারীর সুফল এবং অভরসাকারী কি কুফল।

চোখের সৌন্দর্য এবং দৃষ্টি শক্তি বেড়ে গেল

কাতাদাহ ইবনে নুমান নামক এক সাহাবীর চোখে ওহুদের লড়াইয়ের দিন একটি তীর এসে বিদ্ধ হলে তীর টান দিয়ে বের করলে চোখের মনি সাথে সাথেই বেরিয়ে এল। তিনি চোখের মনিটা হাতে নিয়ে নবীজীর খিদমতে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, আল্লাহ্র কাছে দুআ করুন যেন ভাল হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, চোখ চাও না জান্নাত চাও। তিনি বললেন উভয়ই চাই। আল্লাহ্ তাআলার কাছে কোন কিছুর কমতি নেই। আমার চোখ না থাকলে আমার স্ত্রীর কাছে খুবই খারাপ লাগবে। একথা শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং তাঁর মনিটা হাত থেকে নিয়ে চোখের গর্তে বসিয়ে দিলেন আর দুআ করলেন হে আল্লাহ্! এ চোখকে অপর চোখ থেকে আরো সুন্দর করে দিন। সঙ্গে সঙ্গেই দুআ কবুল হল। অপর চোখের চেয়ে এ চোখের সৌন্দর্য এবং দৃষ্টিশক্তি আরো বেশী হল।

বাদশাহর খুশি বিষাদে পরিণত হল

ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেক ছিলেন একজন উমাইয়া খলীফা। খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের পরবর্তী যুগে তিনি খলীফা হয়েছিলেন। একদিন তিনি বলতে লাগলেন, কে বলে যে, বাদশাহরা আনন্দ উপভোগ করতে পারে না? তাই আমি আজকের দিনটা আনন্দের সাথে উদযাপন করে দেখাব। এবার আমি দেখব কে আমাকে বাঁধা দেয়! লোকেরা বলল, আজকাল চারদিকে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে দুঃসংবাদ আসছে। খলীফা বললেন, আজ আমাকে কোন দুঃসংবাদের খবর তোমরা শোনাবে না। যত বড় বিদ্রোহ হোক আমাকে জানানোর প্রয়োজন নেই। আজকের দিন আমি আনন্দে কাটাতে চাই। তার একটি বাদী ছিল পরমা সুন্দরী। তার রূপের কোন জুড়ি ছিল না। নাম তার হাব্বাবাহ। স্ত্রীদের তুলনায় তাকেই তিনি অধিক ভালবাসতেন। তাকে নিয়ে তিনি অন্দর মহলে চলে গেলেন। ফল আনা হল, বিভিন্ন ফলের শরবতও আনা হল। খলীফা আজকের দিনটি আনন্দে কাটাতে চান। বাঁদীকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলেন। তার মুখে ডালিমের দানা তুলে দিতে লাগলেন।

একটি দানা তুলে দেয়ার সময় বাঁদি কোন কথায় হেসে উঠলে দানা চলে গেল তার শ্বাসনালীতে। সাথে সাথেই দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। যে দিনকে তিনি সবচেয়ে আনন্দের দিন হিসাবে পালন করতে চেয়েছিলেন, সেদিনটিই তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ দিনে পরিণত হল। এতে খলীফা পাগল হয়ে গেলেন, তিন দিন পর্যন্ত বাঁদির লাশকে দাফন করতে দিলেন না। যখন লাশে পচন দেখা দিল, গলতে আরম্ভ করল। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। পরে বনু উমাইয়ার সরদাররা খলিফার কাছ থেকে লাশ ছিনিয়ে নিয়ে দাফন করে দিল। এর দুই সপ্তাহ পরে খলীফাও মৃত্যুবরণ করল।

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার পরিচয়

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদেরকে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়াদী শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরকে মুআল্লিম হিসাবে মদীনায় প্রেরণ করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে মদীনার গোত্রপতি হযরত সাআদ ইবনে মুআয তাঁকে মদীনা থেকে বহিস্কার করার জন্য তাঁর মজলিসে উপস্থিত হলেন। সেখানে অত্যন্ত রুঢ় কণ্ঠে বললেন, তুমি এখানে এসে আমাদের পরিবেশকে খারাপ করছ! কিন্তু তিনিই যখন ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর মর্যাদা এতই উন্নীত হল যে, তাঁর ইন্তিকালে হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি জানেন আজ কার ইন্তিকাল হয়েছে? নবীজী বললেন, না। জিবরাঈল (আ.) বললেন, তার মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। নবীজী বললেন, সাআদ অসুস্থ ছিলেন, তাঁর খবর নেয়া দরকার। জিবরাঈল (আ.) বললেন, তাঁরই মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। এ খবর পেয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটলেন, যে, সাহাবাদের অনেকেরই জুতার ফিতা ছিড়ে গেল। চাদর খুলে গেল। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ক্লান্ত করে দিলেন। নবীজী বললেন, জলদী কর। আমার আশংকা হচ্ছে ফেরেশতারা আবার সাআদকে গোসল না দিয়ে ফেলে আর আমরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাই।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার ঘরে পৌঁছলেন তখন সেখানে শুধুমাত্র তার লাশ পড়েছিল। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে সেখানে প্রবেশ করলেন যেন, অনেক লোকের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করতে করতে যাচ্ছেন। হযরত সাআদের শিয়রে যেয়ে তিনি বসে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, সারা ঘর ফেরেশতা দ্বারা পরিপূর্ণ। আমার জন্য কোন জায়গাই ছিল না। তাই পা গুটিয়ে বসে আছি। সাআদের জানাযায় আজ এমন এমন একদল ফেরেশতার আগমন ঘটেছে যারা এর আগে কখনো মাটি স্পর্শ করেন নি। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআলা পাঠিয়েছেন যে, যাও, তোমরা আমার সাআদের জানাযা পড়ে এস।

কুস্তি লড়ে ঈমান আনয়ন

নবীজীর কাছে এক কুস্তিগীর এল। নাম তার রোকানা। এসে বলল, আপনি যদি আমাকে কুস্তিতে পরাজিত করতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে নবী বলে স্বীকার করব। নবীর মর্যাদা ও মান কত উঁচু। তিনি তার সাথে কুস্তি লড়তে প্রস্তুত হলেন। উদ্দেশ্য হল, এ ওসিলায় একটা লোক যদি জান্নাতী হয়ে যায় তাহলে ক্ষতি কি? তাই তিনি কুস্তির জন্য তৈরী হলেন।

রোকানার গায়ে শক্তি ছিল প্রচুর পরিমাণ। তার শক্তির অনুমান তার পৌত্রের মাধ্যমে আমরা করতে পারি। একবার হযরত আমীর মুআবিয়া (রা:) এর কাছে ঘোড়া উপস্থিত করা হল। ঘোড়াটি ছিল বড়ই দুর্দান্ত। এর উপর কেউ আরোহণ করতে পারত না। যেই এর পিঠে আরোহণ করত তাকেই সে পিঠ থেকে ফেলে দিত। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ রোকানার পৌত্রকে ডেকে বললেন, এ ঘোড়াটাকে কেউ আয়ত্বে আনতে পারে না। তুমি দেখ চেষ্টা করে কিছু করতে পার কি না? রোকানার পৌত্র এক লাফে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হল। ঘোড়া স্বভাব সুলভ ভাবে তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার জন্য চেষ্টা করলে সে উভয় রান দিয়ে ঘোড়ার পেটে এমনভাবে চাপ দিল যে, ঘোড়ার পেট ফেটে নাড়ী ভুড়ি সব বেরিয়ে গেল। তাহলে চিন্তা করুন তার দাদার গায়ের শক্তি কেমন ছিল! পৌত্রের গায়ে এ পরিমাণ শক্তি হলে দাদার কি অবস্থা ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

যাই হোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কালেমা পড়ে নাও এরপর তোমার সাথে কুস্তি হবে। সে বলল, আগে আপনি আমাকে পরাস্ত করুন এরপরে কালেমা পড়ব। কুস্তি শুরু হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই তাকে তুলে যমীনে ফেলে দিলেন, সে বলল, না না ভুল হয়ে গেছে। আবার লড়াই হোক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাকে তুলে যমীনে ছুঁড়ে ফেললেন। এবার সে বলতে লাগল হে মুহাম্মাদ! জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার কোমর মাটি স্পর্শ করেনি আজ সে রেকর্ড ভংগ হল। এবার আপনাকে নবী বলে মেনে নিতে আমার কোন দ্বিধাবোধ নেই।

এক হুর দেখে তিনমাস বেহুশ

আমাদের এক বন্ধু স্বপ্নে হুর দেখে। সে দীর্ঘ তিন মাস যাবত বেহুশ ছিল। ডাক্তাররা জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে? সে বলল, শুধুমাত্র হুর দেখেছি আর কিছু নয়। হুরকে স্বপ্নে দেখে যদি এ অবস্থা হয় তাহলে বাস্তবে দেখলে কেমন হবে? তাই জান্নাত বাকি, নগদে পাওয়ার সম্ভাবনা রাখা হয়নি। হুরের একটি অঙ্গুলীর সামনে সূর্যের আলো যেখানে নিষ্প্রভ। হুরদেরকে ঈমানদার বান্দাদের জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হবে।

আল্লাহ্ তাআলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন তখন হযরত জিবরাইল (আ.) কে বললেন, আমার জান্নাত দেখে আস। যখন তিনি জান্নাতের দোরগোড়ায় উপস্থিত হলেন তখন এর উপর নূরের তাজাল্লী প্রতিফলিত হলে তিনি বললেন, সুবাহানাল্লাহ। আজ আল্লাহ্র দীদার নসীব হয়ে গেল। কাজেই তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছতে পারতেন। এর উপরে আর কেউ যেতে পারে না। সেখানে সর্বদা আল্লাহ্পাকের তাজাল্লী পড়তে থাকে। কিন্তু তিনি জান্নাতের তাজাল্লী দেখেই বললেন, আজ আল্লাহ্র দীদার নসীব হয়ে গেল। তাই সিজদায় পড়ে গেলেন। আওয়াজ এল, হে রুহুল আমীন! তাজাল্লী দেখেই সিজদায় পড়ে গেলে, মাথা উঠিয়ে তো দেখ। যখন মাথা তুললেন তখন দেখলেন জান্নাতের হুর মুচকি হাসিতে দাঁড়িয়ে। তার দাতের ফাঁক দিয়ে যে চমক বের হচ্ছিল এতেই জিবরাইল (আ.) মনে করছিলেন আল্লাহ্র দীদার

নসীব হয়ে গেছে। জিবরাঈল (আ.) বললেন, যিনি তোমাকে পয়দা করেছেন তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হুর বলল, জান আমি কার? জিবরাইল (আ.) বললেন, না। হুর বলল, যে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর কুরবান করে দেয়, আমিই হব তার!

এক যুবকের অন্তরে সুন্নাতের মহব্বত

করাচীতে এক ব্যক্তির একটা বাচ্চা জন্ম হয়েছিল এবং কানাডায় সে বড় হয়েছিল। অনেক বিত্তশালী পরিবারের সন্তান ছিল সে। মা তার কানাডায় রয়ে গিয়েছিল। আর বাবা তাকে নিয়ে করাচী এসেছিল। রাস্তায় একদিন আমাদের এক সাথির সাথে তার সাক্ষাত হল। সালাম-কালাম শেষে মহব্বতের সাথে তাঁকে মসজিদে আসার দাওয়াত দিল। সে দাওয়াত কবুল করে সাথে সাথেই মসজিদে এসে দ্বীনী কথাবার্তা শুনল। এক সময় কথাগুলো মনে ধরলে সে চিন্তা করল সব মুসলমানই কি তাবলীগওয়ালা? তাহলে আমি কি তাবলীগ করব? আমি তো কিছুই জানি না। সাথিরা বলল, নামায সম্পর্কে তুমি জানই। ব্যস একথাটাই তোমার বন্ধুদেরকে বলতে থাক। এটাই তাবলীগ। কথাটা তার মনোপুতঃ হল। সে এভাবে তিন চিল্লা লাগিয়ে ফেলল। তিন চিল্লা শেষ হওয়ার পর যখন ঘরে ফেরার পালা এল তখন মুখে চাপ দাড়ী। এ অবস্থাতেই সে ফিরে গেল বাড়ীতে। কিন্তু বাবা তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিল। এক বছর পর্যন্ত বাড়ীতে জায়গা দিল না। অনেক চেষ্টা করে বাবাকে রাজি করে এরপরে সে বাড়ী ফিরল। বাবা তাকে বলল, বেটা! তুমি এ বয়সে দাড়ী রেখে ফেললে, কে তোমাকে মেয়ে দেবে? ছেলে বলল, যে নবীর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ্পাক তাকে উত্তম জীবন সংগীনী দান করেন। সে আল্লাহ্ আমাকেও তা প্রদান করবেন। এ ছেলের বয়স ছিল ১৫/১৬ বছর।

আমাদের আরেক সাথি তাবলীগে তিন দিন সময় অতিবাহিত করেছিল। তিন দিন সময়ে তার দাড়ী রাখার জযবা পয়দা হয়ে গেল। কিন্তু তার স্ত্রী সে পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। সাথি পেরেশান, পরিশেষে একটি কৌশল সে বের করল এবং স্ত্রীকে বলল, দ্বিতীয় আরেকটা বিবাহ করার চিন্তা ফিকির করছি। কেননা তুমি আমার হক ঠিকমত আদায় করতে পারছ না। স্ত্রী বলল আপনি দাড়ী রাখেন তাও ভাল কিন্তু মেহেরবানী করে দ্বিতীয়

বিবাহ করবেন না। দেখুন সুন্নাতকে সমুন্নত রাখার জন্য কতইনা ফন্দি-ফিকির। আর অনেকেই বিধর্মীর অনুসরণে এ সামাজিকতা রক্ষা করতে গিয়ে সুন্নাতের কতইনা অমর্যাদা করে চলছে। আক্ষেপ সে সব মানুষের জন্য যারা উত্তমকে অধম আর অধমকে উত্তম মনে করে জাগতিক জীবন অতিবাহিত করছে।

এক বেদুঈনের ঘটনা ও হযরত হুযাইফার সাক্ষ্য

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সফরে যাচ্ছিলেন। পথে এক বেদুঈনের কাছ থেকে একটি ঘোড়া কেনার শর্তে বললেন টাকা মদীনায় ফিরে গিয়ে দেব। বেদুইন বলল, ঠিক আছে। ঘোড়া বেদুইনের কাছে রেখে তিনি চলে গেলেন। পিছন থেকে সাহাবায়ে কিরামের একটি জামাআত এল। তাঁরা দেখলেন সুন্দর একটি ঘোড়া দাঁড়ানো। তাঁরা জানেন না যে, এটি নবীজী কিনেছেন। তাই তাঁরা ঘোড়ার দাম বলতে শুরু করলেন। নবীজীর সাথে ধার্যকৃত দামের চেয়ে তাঁরা আরো বেশী দাম বললেন। অধিক দাম পেয়ে বেদুইনের নিয়ত পরিবর্তন হয়ে গেল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঘোড়া নিলে নিন নয় তো এদের কাছে বিক্রি করে দেব। নবীজী বললেন, তোমার সাথে কথাই হয়েছে যে, মদীনায় যেয়ে তোমাকে মূল্য পরিশোধ করব। তুমি এখন নগদ টাকা পেয়ে চুক্তির কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? বেদুইন বলল, কোন চুক্তি হয়নি। নিলে নগদে নিয়ে নিন নতুবা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিলাম। নবীজী ছিলেন একা। তাঁর সাথে কোন সাক্ষী ছিল না। কিন্তু পিছন থেকে হযরত হুযাইফা (রা.) বললেন হ্যাঁ। এরকমই চুক্তি হয়েছে। আমি এর সাক্ষী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে না। তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ? হযরত হুযাইফা (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যখন আসমানের সংবাদ আমাদেরকে শোনান তখন আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করি। তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করি না, তাহলে আপনি যখন ঘোড়ার সংবাদ দিচ্ছেন সেটাকে আমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ কথায় খুবই মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর সাক্ষ্যকে দুইজনের সাক্ষ্যর মত বলে ঘোষণা দিলেন। এরপর থেকে হোযাইফা (রা.)-এর সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হত।

হযরত আমর ইবনে জামুহ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

হযরত আমর ইবনে জামুহ প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তেমন একটা আগ্রহী ছিলেন না। তার ছেলে মুসলমান হয়েছিল। আমর বললেন, আমি আমার মূর্তি পরিত্যাগ করতে পারব না। ছেলে রাতে এসে মূর্তিগুলোকে তুলে বাইরে রেখে এল। সকালে আমর দেখলেন মূর্তি নেই। ঘর খালি। এদিক সেদিক সন্ধান করতে করতে বাইরে যেয়ে দেখে খোদা আস্তাকুঁড়ে পড়ে রয়েছে। হায় আমার মাবুদ। তোমার সাথে কে এমন আচরণ করল? জানতে পারলে তার গর্দান উড়িয়ে দেব। যাই হোক খোদাকে সেখান থেকে উঠিয়ে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে আবার ঘরে এনে স্থাপন করল। পরের রাতে ছেলে আবারও তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে এল। সকালে দেখে খোদা আবার গায়েব। কয়েকদিন চলল এ অবস্থা। একদিন আমর ইবনে জামুহ বলল, হে আমার খোদা, আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি। ঠিকমত তোমার দেখাশুনা করতে পারি না, তোমার কাছে এ তলোয়ার রেখে দিচ্ছি। তুমি নিজেই আত্মরক্ষা কর। এ বলে সে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন তার বয়স সত্তর বছর। ছেলে রাতে এসে দেখল খোদার পাশে এবার তলোয়ার শোভা পাচ্ছে। তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সারা মদীনা ঘুরে ঘুরে এক জায়গায় দেখতে পেলেন একটি মৃত কুকুর পড়ে আছে। শরীর তার ফুলে ফেটে গেছে। সেটিকে তিনি ঘরে এনে তার পায়ের সাথে মূর্তির পা বেঁধে বাইরে ফেলে দিয়ে এলেন। পিতা সকালে উঠে দেখে খোদা আবার গায়েব। তরবারী যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রয়েছে। মনে মনে বলল, হায় আফসোস। কে আমার খোদার সাথে এ বেয়াদবী করছে, তার সর্বনাশ হোক। এর পরে খুঁজতে খুঁজতে বাইরে এসে দেখে মরা কুকুরের পায়ের সাথে খোদার পা বাঁধা। এবার তার বিবেকে কষাঘাত হল। ভাবল এ যদি খোদাই হবে তাহলে কুকুরের পায়ের সাথে বাধা পড়ে কিভাবে? এরপর ইসলাম সম্পর্কে তার আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বই রইল না। সত্তর বছর বয়সে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। নবীজীর সাথে এক বছর থাকতে না থাকতেই উহুদ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তার এক পা ছিল ল্যাংড়া। কিন্তু তাঁরও জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা হল।

বললেন জিহাদে যেয়ে আমি শহীদ হতে চাই। ছেলেরা নিষেধ করল। বলল আমরা যাচ্ছি, আপনি না গেলেও চলবে। কিন্তু তিনি তা মানতে রাজি হলেন না। পরিশেষে মুকাদ্দামা নবীজীর দরবার পর্যন্ত পৌছে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো মাজুর, তোমার উপরে জিহাদ ফরয নয়। আমর (রা.) বললেন, আমার আকাংখা যে, আমি এ ল্যাংড়া পা নিয়েই জান্নাতে চলাফেরা করব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিহাদে যাওয়ার এজাজত দিলেন। চিন্তা করুন ভাইয়েরা আমার! সত্তর বছরের কাফের মাত্র এক বছর নবীর বাণীর অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কোন পর্যায়ে পৌছে গেছেন। তিনি উহুদের ময়দানে শহীদ হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আমর জান্নাতের যমীনে হেটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ল্যাংড়া পায়ে নয় বরং সুস্থ পায়ে।

আজ থেকে আমি তোমার পিতা আর আয়েশা তোমার মাতা

হযরত বাশীর ইবনে উকবা (রা.)-এর মাতা শৈশবেই মারা গিয়েছিলেন। তিনি পিতার হাত ধরে মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করেন। মদীনায় আসার পরে জিহাদের দামামা বেজে উঠলে তাঁর পিতা জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি একথা চিন্তা করলেন না যে, আমার এ ছোট সন্তানের মা মারা গেছে। আমি যদি জিহাদে চলে যাই তাহলে এ সন্তানের কি হবে। কে এর দেখা-শোনা করবে? এসব চিন্তা করার সময় কোথায়? তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন জিহাদে। জিহাদ শেষে সেনাবাহিনী যখন মদীনায় ফিরতে লাগল তখন মদীনাবাসীরা তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গেলেন। একে একে সকল মুজাহিদ প্রবেশ করলেন। কিন্তু হযরত বাশীর তাঁর পিতাকে খুঁজে পেলেন না। তিনি ছুটে গেলেন নবীজীর সামনে। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আব্বাকে দেখছি না, তিনি কোথায়? বাশীরের বয়স তখন সাত বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিক থেকে চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি সেদিকে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলে নবীজী সেদিক থেকেও চেহারা ঘুরিয়ে

নিলেন। এভাবে চার বার চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আর এ বাচ্চা এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে বার বার একই কথা জিজ্ঞাসা করছিল ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার পিতার খবর কি?”

নবীজীর চোখেও অশ্রু দেখা দিল। সে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল পবিত্র মুখমণ্ডলে। কিভাবে তিনি জানাবেন সাত বছরের এ শিশুকে তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ। হযরত বাশীর বুঝে গেলেন, তার পিতা আর এ জগতে নেই। পিতার স্নেহ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়ে গেছেন, মায়ের ছায়া আগেই উঠে গিয়েছিল। তিনি নবীজীর কাছে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতা-মাতা সকলকেই হারালাম এবার আমি কার কাছে আশ্রয় নেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোলে তুলে নিলেন, বললেন আজ থেকে আমি তোমার পিতা আর আয়েশা তোমার মাতা।

মাত্র এক রাতের বিবাহিতা জীবন–অতঃপর শহীদ

হযরত হানজালার (রা.) রাতে বিবাহ হয়েছিল। সকালে গোসল করতে যেয়ে কেবল মাত্র মাথায় পানি ঢেলেছেন এমন সময় যুদ্ধের ময়দান থেকে মুসলমানদের পরাজয়ের খবর ভেসে এল। তিনি গোসল অসম্পূর্ণ রেখেই ছুটলেন জিহাদের ময়দানে। মাত্র এক রাতের বিবাহিত জীবন। এরপর শহীদ হয়ে গেলেন জিহাদের ময়দানে। ফেরেশতারা তাঁর লাশ উঠিয়ে নিয়ে গেলেন আকাশে এবং সেখানেই গোসল দিলেন জান্নাতের পানি দিয়ে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন হানজালাকে গোসল দেয়া হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্চর্য হলেন যে, শহীদকে কেন গোসল দেয়া হচ্ছে। শহীদকে তো গোসল ছাড়াই দাফন করতে হয়। গোসল শেষে তাঁর লাশ নীচে নেমে এল। সাহাবায়ে কিরাম দেখলেন তাঁর মাথা দিয়ে গোসলের পানি ঝরছে। পরে সংবাদ নিয়ে জানা গেল যে, তিনি ফরয গোসল না করেই জিহাদের ময়দানে ছুটে এসেছিলেন এবং সে অবস্থাতেই শহীদ হয়ে গেছেন তাই আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর গোসলের ব্যবস্থা করলেন। তিনি কিন্তু বিবির হকের কথা একবারও চিন্তা করলেন না। তার নতুন সংসার বিরান হয়ে গেল। অথচ আমরা বলছি ঘর-বাড়ী, সন্তান-সন্তুতি ফেলে চিল্লায় যাওয়া এটা আবার কোন ইসলাম? এখন আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে ফয়সালা করুন।

আল্লাহ্ যার যামিনদার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, আমার কিছু টাকার দরকার, আমি পরদেশী এক মুসাফির। আর বাড়ী হচ্ছে সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত জনপদে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আমি যে তোমাকে কর্জ দেব এর জন্য স্বাক্ষী হবে কে? প্রথম ব্যক্তি বলল, স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ তাআলাই যথেষ্ট। সে জিজ্ঞাসা করল, কত টাকা প্রয়োজন তোমার? ঋণগ্রহীতা বলল, তিন শত টাকা। সে তাকে ঋণ দিয়ে দিল এবং পরিশোধের তারিখও নির্ধারিত হয়ে গেল। ঋণ পরিশোধ করার সময় যখন ঘনিয়ে এল তখন সমুদ্রে ছিল প্রচণ্ড ঢেউ, নৌকা সব কুলে ভিড়ে ছিল। পারাপার ছিল বন্ধ। সে সমুদ্রের কিনারে বসে বলতে লাগল, ইয়া আল্লাহ্! তোমাকে স্বাক্ষী রেখে ঋণ গ্রহণ করেছিলাম। তোমাকেই জামিন রেখেছিলাম এখন যদি নির্ধারিত সময়ে তার কাছে পৌছতে না পারি তাহলে তোমার স্বাক্ষী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যাবে। আমার সাধ্যে যতটুকু ছিল তা আমি করলাম এখন সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। একথা বলেই গাছের বড় একটা গুড়ি মাঝখান থেকে খোল করে সেখানে টাকার থলিটা রেখে একটি চিঠি লিখে দিল সে যে, আমি উত্তাল তরঙ্গের কারণে সময় মত তোমার কাছে পৌছতে পারলাম না। তাই এ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে তোমার টাকাগুলো রেখে দিলাম। যাকে আমি জামিন রেখেছিলাম তিনিই তোমার নিকট এগুলো পৌছে দেবেন। একথা বলেই গুড়িটিকে পানিতে ভাসিয়ে সে ব্যক্তি বাড়ী ফিরে গেল।

নির্দিষ্ট সময়ে ঋণদাতা নদীর তীরে বসে আছে নৌকার অপেক্ষায়। যখন কোন নৌকা নজরে এল না তখন মনে মনে বলতে লাগল আল্লাহ্র নামে ওয়াদা করে সে ওয়াদা খেলাফ করল! একথা বলে ফেরার মুহূর্তে তার দৃষ্টি পড়ল কাঠের গুড়িটির উপর। জ্বালানীর কাজে লাগানো যাবে ভেবে সেটিকে তুলে নিয়ে গেল বাড়ীতে। বাড়ীতে নেয়ার পরে সেটিকে ফাড়ার জন্য কুড়ালের আঘাত করলে তাতে ঝন ঝন শব্দ হতে লাগল এবং দিরহামগুলো বাইরে বেরিয়ে এল। সাথে সাথে একটি চিঠিও তার দৃষ্টি গোচর হল। সেটি পড়ে বুঝতে পারল তার ঋণ পরিশোদের অপূর্ব ব্যবস্থার কথা।

এক আরবী যুবকের আশ্চর্য্যজনক কাহিনী

জিদ্দা থেকে এক আরব যুবক এসেছিলেন পাকিস্তানে। তিনি ছিলেন ভাল একজন আলেম। তিনি বললেন, আমি এখানে কেন এসেছি তা জান? বললাম বল। তিনি বললেন, আমি জিদ্দায় থাকি। আমাদের সউদী যুবকরা লেখা-পড়ার জন্য আমেরিকায় যেত কিন্তু তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা থাকত মারাত্মক আকিদা বিধ্বংসী। সেখানে গেলে যিনা-ব্যভিচার, শরাব ইত্যদিতে খুব সহজেই মেতে ওঠা যায়। কিন্তু কিছু দিন যাবত লক্ষ্য করছি যে, তাদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকা থেকে এমন অবস্থায় ফিরে এসেছে যে, তাদের মুখে দাড়ী আর মাথায় পাগড়ী শোভা পাচ্ছে। তাদের মুখে কুরআন-হাদীসের আলোচনা শোনা যায়, রাতে তারা নামাযে দাঁড়িয়ে চোখের অশ্রু ফেলতে থাকে। আমি তাদের এ আচরণে বড়ই আশ্চর্যবোধ করলাম। কেননা তারা যখন আরবের মাটিতে ছিল তখন ছিল বেদ্বীন। আমেরিকায় যেয়েও বেদ্বীন হওয়ার কথাই ছিল কিন্তু সেখান থেকে তারা নবীর সুন্নাত নিয়ে ফিরে এসেছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, পাকিস্তানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনকে যিন্দা করার একটি মেহনত চালু রয়েছে। সেখান থেকে আমেরিকায় জামাআত আসছে। আমরা তাদের সাথে উঠা-বসার কারণে দ্বীনের চেতনা আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে।

যুবক ছিল একজন কবি। রায়ব্যাণ্ডের বার্ষিক ইজতিমার সময় সে পাকিস্তানেই ছিল। ইজতিমার মাঠে উপস্থিত লাখ লাখ মুসল্লি দেখে তার জযবা উথলে উঠল এবং তিনি দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাগুলোর ভাবার্থ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহু আকবার! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন আলোকিত হচ্ছে, আর এখানে তাঁর নূরের দ্যূতি দেখা যাচ্ছে।

২. এ সব লোকদের উপর আল্লাহ্ পাকের রহমত-বরকত অবতীর্ণ হচ্ছে। যাদের আধিক্যের কারণে ভূমি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

৩. এরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে এসেছে। রাতের আঁধারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছে। এমন স্ত্রীদেরকে তারা ছেড়ে এসেছে যাদের পায়ের নুপুরের আওয়ায এখনো তাদের কানে ঝংকার তুলছে। এরপরও বুকে পাথর রেখে এখানে উপস্থিত হচ্ছে।

৪. তারা ঘর ছেড়েছে, দেশ ছেড়েছে, ছেড়েছে স্ত্রীদেরকেও। ছেড়েছে সন্তানের মহব্বত। পিতা-মাতার বিচ্ছেদ তারা সহ্য করেছে। আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ করার জন্য আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরকে উদ্ভাসিত করার জন্য তাঁরা চলছে।

৫. কখনও বয়ান হচ্ছে, কখনো বা তালীম। আবার কখনো হিদায়াত। তাদের চিন্তা একটাই, কি করে গোটা পৃথিবী দ্বীনে মুহাম্মাদীর মেহনতের ময়দান হবে।

এ কবিতাগুলো সে তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করে পড়েছিল। এ বছর তিনি আবারও এসেছিলেন। তখন রাইব্যাণ্ডে পুরাতন সাথিদের দশ দিনের জোড় চলছিল। এ আরবীয় যুবকের নাম ছিল আহমদ। আমি তাঁকে বললাম শায়েখ আহমদ, আপনার গত বারের কবিতাগুলো বড়ই চমৎকার ছিল। এর সাথে আরো কিছু সংযোগ করে যদি আমাদেরকে শোনাতেন তা হলে আমরা বড়ই আনন্দিত হতাম। তখন সে আরো কিছু কবিতা শোনাল। এসবের সারমর্ম কিছুটা ছিল এ রকম ঃ

১. আজ আমি দেখতে পাচ্ছি তাবলীগের এ কাজ এত দূর পৌছে গেছে যে, তা সুরাইয়া সিতারাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

২. মানুষ যে শীর্ষ মর্যাদা লাভ করে তা তো তার মেহনতের কারণেই। অর্থেও হয় না, বিত্তেও হয় না, হয় শুধু মেহনতের মাধ্যমে।

৩. যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্য করবে আল্লাহ্ তাআলা তার সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ পাক তাকে অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত করবেন।

৪. কাল হাশরে নবীজী এবং তাঁর সাহাবাদের সাথে আনন্দ সহকারে সময় অতিবাহিত করবে সে। সেখানে অবস্থান করবে অনাদী-অনন্তকাল।

আমি তাঁকে উৎসাহ প্রদান করে বললাম, আরব তো আরবই।

আজ চার দিন হচ্ছে এক লোকমা খানাও আমার পেটে পড়েনি

একটি বাগানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)। খেজুর গাছের পাকা পাকা খেজুর কাঁদি থেকে ঝরে মাটিতে পড়েছিল। যেগুলো সাধারণত কেউ খায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সেগুলো উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেতে লাগলেন। ইবনে উমরকে বললেন, তুমি খাচ্ছ না কেন? তিনি বললেন, আমার ক্ষুধা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কিন্তু ক্ষুধা আছে। আজ চার দিন হচ্ছে, এক লোকমা খানাও আমার পেটে পড়েনি।

আল্লাহ্‌র কাছে তার হাবীবের চেয়ে প্রিয় পাত্র আর কেউ ছিল না এই দুনিয়াতে। নিজের প্রিয়তমকে কষ্টে ফেলে কেউ কি খুশি হতে পারে? আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দাকে চাই সে কাফের হোক বা মুসলমান আপন মায়ের চাইতে সত্তরগুণ বেশী মহব্বত করেন, স্নেহ করেন। তাহলে স্বীয় হাবীবকে তিনি কত মহব্বত করেন, অথচ সে হাবীবই বলছেন, আজ চার দিন আমি এক লোকমাও মুখে দেইনি। নবীজী বলেছেন, আমি যদি চাইতাম তাহলে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে গোটা দুনিয়া আয়ত্বে দিয়ে দিতেন। আমি যদি চাইতাম তাহলে তিনি রোম পারস্যের ধন ভান্ডার আমার পায়ের নীচে এনে দিতেন। কিন্তু আমি চাইনি। হে আবদুল্লাহ! এমন এক যামানা আসবে যখন মানুষের ঘরে বছরের পর বছরের খাদ্য পড়ে থাকবে, এরপরও তারা বলবে আরো কিভাবে হাসিল করা যায়। তাদের একীন নষ্ট হয়ে যাবে। আর শুনে রাখ, আমি কিন্তু কালকের জন্যও জমা করে রাখা অপছন্দ করি।

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্‌র মদদ

বদর প্রান্তর। আল্লাহ্‌র মদদ, সাহায্য ও নুসরত সেখানে নাযিল হল। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করছেন, যখন তোমরা আমাকে ডাকলে, আমি তোমাদের ডাক শুনলাম। হাজার কাফেরের মোকাবিলায় হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করলাম।

তারা যেহেতু কুরবানীর জন্য পুরাপুরি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন তাই আল্লাহ্‌র সাহায্যও সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। কাফেররা দেখল জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে আসমান থেকে অবতরণ করছেন। ঘোড়ার হ্রেষা রবও তারা শুনতে পেল। শয়তান কাফেরদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং তাদেরকে সাহস দেয়ার জন্য হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদেরকে বলছিল, আজ তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। আমি তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু যখন দেখল জিব্‌রাঈল

আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের বাহিনী নিয়ে অবতরণ করছেন, তখন হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করল। কাফেররা জিজ্ঞাসা করল, আরে কোথায় যাও, কোথায় যাও? সে বলল, আমি এমন জিনিষ দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখছ না। একথা বলেই একেবারে সমুদ্রে যেয়ে ঝাঁপ দিল। আল্লাহ্‌র কাছে বলল, ইয়া আল্লাহ্! তুমি কিন্তু আমার সাথে ওয়াদা করেছ কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেয়ার। অতএব আমাকে বাঁচাও, এরা ধ্বংস হয় হোক। আমি বাঁচি।

যাই হোক আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য এল, আল্লাহ্‌পাক তাদের সব অহংকার ধুলায় মিশিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, আমার নবীর ইশারায়, আমার নবীর হুকুমে যে দাঁড়িয়ে যায় তার সাহায্য আমি এভাবেই করে থাকি। তিন ব্যক্তি উতবা-শায়বা ওলীদ, পিতা-পুত্র এবং চাচা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলার জন্য ময়দানে এসে হাজির হল। তাদের মুকাবিলায় মুসলমানদের থেকে তিন জন আনসার মুখোমুখি হলেন। উতবা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কারা? তাঁরা বললেন, আমরা আনসার। উতবা বলল, তোমাদের সাথে আমি লড়াই করতে চাই না। আমাদের খান্দানের লোকেরা কোথায়? যারা মক্কা থেকে পালিয়ে এসেছে, তারা কোথায়? উতবার হুংকার শুনে হযরত আলী, হযরত হামযা এবং হযরত উবায়দা (রা.) বেরিয়ে এলেন। দুই জন চাচার ছেলে আর একজন চাচা। উতবা বলল, হ্যাঁ এবার আমাদের প্রতিপক্ষ ঠিক আছে। শুরু হল লড়াই। এদিকে দু'আর জন্য নবীজীর হাত উঠল রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল আল্লাহ্‌র মদদ। নিহত হল তিন কাফের। হযরত আবু উবাইদা আহত হয়ে পড়ে গেলেন যুদ্ধের ময়দানে। তাঁকে উঠিয়ে এনে নবীজীর কদম মুবারকে শুইয়ে দেয়া হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমি কি শহীদের মর্যাদা লাভ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। বললেন, নিশ্চয়ই তুমি শহীদ। আতি এর স্বাক্ষী। তাঁকে দাফন করা হল। অনেক দিন পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে সাহাবায়ে কিরামের এক জামাআত নিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তাঁর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সকলেই এক সুগন্ধি অনুভব করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের এ খোশবু? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা জান না? আবু উবায়দার কবর থেকে আসছে এ খোশবু ছাড়াচ্ছে।

আনসারদের রাসূলপ্রীতি

হুনাইনের যুদ্ধে যত মালে গনীমত হস্তগত হয়েছিল সব মক্কার কুরাইশদেরকে দিয়ে দিলেন। আনসারদেরকেও কিছু দিলেন না, মুহাজিরীনদেরকেও কিছু দিলেন না। কিন্তু কিছু আনসারী যুবক বলাবলি করতে লাগল, যুদ্ধ করলাম আমরা আর মাল পায় অন্যরা। নবীজীর কানে কথাটা পৌঁছে গেল। তিনি হযরত সাআদ বিন উবাদাকে ডাকলেন, বললেন, কি ব্যাপার কি শুনছি আমি? সাআদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কোন মন্তব্য করিনি। আমাদের অল্প বয়স্ক কিছু ছেলেরা এসব বলাবলি করছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদেরকে একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন। একটি তাঁবুতে তারা সমবেত হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বললেন।

তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে আল্লাহ্ তাআলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন, তোমরা বিচ্ছিন্ন ছিলে, আল্লাহ্ তাআলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। ইসলামের মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন, তোমাদেরকে আনসার বানিয়েছেন, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলেরই ইহসান। আমার একথা কি ঠিক নয়?

আনসাররা বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার সব কথাই ঠিক, আমরা এরকমই ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনসাররা! তাহলে তোমারা ইচ্ছা করলে এটাও বলতে পার যে, আপনি শুন্য হাতে আমাদের কাছে এসেছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। লোকেরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমরা আপনার সত্যায়ন করেছি। লোকেরা আপনার সঙ্গ ত্যাগ করেছিল আমরা আপনাকে সঙ্গ দান করছি। আনসাররা একথা শুনে নবীজী ক্রন্দন করতে লাগলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন, হে আনসারগণঃ তোমরা কি এতে খুশি নও যে, লোকেরা ভেড়া-বকরী নিয়ে যাবে আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সাথে নিয়ে যাবে! হে আনসারগণ, আল্লাহ্‌র কসম, হিযরতের ফযীলত না থাকলে আমি নিজেকে আনসার বলতাম। তোমরা যদি একদিকে চল আর অন্য সকলে আরেক দিকে চলে তাহলে আমি তোমাদের সাথেই থাকব। এখন আমার জীবন ও মৃত্যু তোমাদের সাথেই সম্পর্কিত।

আনসাররা কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের পানিতে দাড়ী ভিজে যেতে লাগল। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রাজ্য চাই না, মাল চাই না, আমরা তো আপনার সন্তুষ্টি চাই, আপনার নির্দেশ চাই।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতে দাঁড়িয়ে দু'আ করছিলেন। তখন আনসারা নীচে দাঁড়িয়ে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, মনে হচ্ছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনে জন্মভূমির মায়া জেগে উঠেছে। তিনি যদি আর মদীনায় ফিরে না যান। যদি মক্কাতে থাকা পছন্দ করেন? ওহীর মাধ্যমে নবীজীকে জানিয়ে দেয়া হল আনসারদের এ উদ্বেগের কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে নিশ্চিত করলেন, বললেন আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমার জীবন মৃত্যু সব তোমাদের সাথেই হবে। সে ওয়াদা আমি ভুলে যাইনি। আনসাররা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা শুধু মহব্বতের জযবায় একথা বলছিলাম। আপনার বিচ্ছেদ আমরা বরদাশত করতে পারব না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় তোমরা সত্য কথাই বলেছ।

হযরত শুরাহবীলের ঈমানী শক্তি

হযরত শুরাহবীল (রা.) ছিলেন একজন হালকা পাতলা সাহাবী। তিনি ছিলেন ওহী লেখকদের অন্যতম। মিশরের একটি কেল্লা কোন ভাবেই জয় করা যাচ্ছিল না। অবরোধের সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল। একদিন হযরত শুরাহবীল জোশে এসে ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার দেয়ালের কাছে যেয়ে হাজির হয়ে বললেন, হে কিবতীরা শোনঃ আমরা তোমাদের এমন এক আল্লাহ্‌র দিকে যাচ্ছি যিনি এ কেল্লা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলে মুহূর্তেই তা করতে পারেন।

এর পর তিনি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার বলে শাহাদত অঙ্গুলী উঁচু করার সাথে সাথেই সমস্ত কেল্লা ধুলিস্যাত হয়ে গেল। এ কালেমার হাকীকত তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ছিল তাই কালেমার শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথেই কেল্লা ধ্বসে পড়ল। এটা হল কালেমার শক্তি।

কওমে লুতের ধ্বংসের কারণ

যখন হযরত লুত আলাইহিস সালাম-এর কওমের মধ্যে অশ্লীলতা সয়লাব হয়ে পড়ল আর তারা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হল তখন নেমে এল আল্লাহ্‌র গযব। তারা এমনই এক দুষ্কর্ম প্রচলনকারী কওম ছিল যারা সর্বপ্রথম এ জঘন্য কাজের সূচনা করেছিল। তাদের পূর্বে এ কাজ কেউ কখনো করেনি। সেজন্য তাদের উপর আযাবও এমন এল যা অন্য কোন কওমের উপর আসেনি। যতগুলো আযাব কওমে লুতের উপর এসেছিল অন্য কোন কওমের উপর তা আসেনি। আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালামকে এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, এদেরকে জমিন থেকে তুলে আন। হযরত জিবরাইল স্বীয় পাখার দ্বারা পুরা দেশ উপড়ে ফেলে প্রথম আসমান পর্যন্ত তুলে দিলেন। প্রথম আসমানের ফেরেশতারা তাদের হাঁস-মুরগীর আওয়ায শুনতে পেল। এরপর তাদেরকে উল্টা করে নিক্ষেপ করা হল। এর পর শুরু হল পাথুরে বৃষ্টি। যার কারণে তাদের আকৃতি বিকৃত হয়ে গেল। চোখ কোটরাগত হয়ে গেল। চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। প্রস্তর বৃষ্টির কারণে জমিনের উপরের অংশ নীচে আর নীচের অংশ উপরে হয়ে গেল। এরপর চিরদিনের জন্য পানির আযাবে গ্রেফতার হয়ে গেল মৃত সাগর। মৃত সাগরটি সত্তর বর্গমাইলের একটি হ্রদ। সেখানে কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। সেখানে গেলেই মারা যায়। সে কুদরতী আযাবে আজও তারা গ্রেফতার হয়ে আছে। এটা হল কালেমার শক্তি যা কওমে লুতের শক্তিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

মেসওয়াক করার দ্বারা কেল্লা জয়

সাহাবী যুগের এক ঘটনা। কোন এক যুদ্ধে দুশমনদের একটি কেল্লা দখল করা যাচ্ছিল না। এতে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কি কারণে দূর্গের পতন ঘটছে না। সকলেই কারণ তালাশ করতে বসে গেলেন। ভায়েরা আমার! মুসলমানদের দূরদর্শীতা দেখুন, কিসের ভিত্তিতে তারা কিসরা-কায়সারকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন সেটা চিন্তা করে দেখুন। তারা চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে ধারণা হল যে, আজ কয়েকদিন যাবত ব্যস্ততার কারণে মিসওয়াকের সুন্নাত ছুটে গেছে।

সকলকেই নির্দেশ দেয়া হল মিসওয়াক করতে। আর আমরা তো আজ রীতিমত এসব নিয়ে উপহাস করি। ডাল একখানা মুখে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন আধুনিক যুগ, ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে। বলুন ভাই এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র মদদ কিভাবে আসবে? মিসওয়াকের সুন্নাত ছুটে যাওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র সাহায্য বন্ধ হয়ে আছে যে, তোমরা আমার হাবীবের সুন্নাতকে অবহেলা করে বসে আছ। সুতরাং আমার সাহায্যও তোমাদের থেকে দূরে থাকবে। সকলেই মিলে মিসওয়াক শুরু করলে দুশমনরা মনে করল এরা দাঁতে ধার দিচ্ছে, না জানি আমাদেরকে জীবন্ত খায় কিনা। এ কল্পিত ভয়ে ভীত হয়ে তারা সবই পালিয়ে গেল আর দূর্গ এতেই বিজিত হয়ে গেল।

তাঁরা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ আর আমরা এখন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন

সিরিয়া অভিমুখে মুসলমানদের আট হাজারের একটি বাহিনী রওয়ানা হল। বাহিনীর আমির ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)। কাফের বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লাখ। আসহাবে সুফফার অধিবাসী এক সাহাবী বলতে লাগলেন, আমাদের তখন এমন অবস্থা ছিল যেমন কাল একটি ষাড় এর শরীরে সাদা একটি ফোটা। অর্থাৎ দুমশন বাহিনীর মোকাবিলায় আমরা ছিলাম অতি নগণ্য। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে আমরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। ভায়েরা আমার! তাঁদের কিন্তু তখন এ অবস্থাই ছিল। তাঁদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা কত বেশী। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ঐক্যবদ্ধ আর আমরা এখন পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। তাদের মধ্যে গোত্র-বর্ণের কোন বিভেদ ছিল না কিন্তু আমরা দেশ-জাতি, রাষ্ট্র, ভাষা-বর্ণ ইত্যাদিতে নিজেদেরকে বিভক্ত করে ফেলেছি। এজন্যই তাঁদের আহ্বান সরাসরি আরশে পৌঁছে যেত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি দেখলাম আসমান ফেটে গেল আর সেখান থেকে অশ্বারোহী বাহিনী অবতরণ করতে শুরু করছে। তাঁদের মাথায় ছিল পাগড়ী বাঁধা, হাতে ছিল বর্শা। সকলের আগে আগে এক অশ্বারোহী এ ঘোষণা করতে করতে আসছিলেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমরা আনন্দিত হও, তোমাদের রব তোমাদের সাহায্যে এসে গেছেন।

রাসূলের দরবারে ফরিয়াদী উট

একদিন নবীজির খিদমতে একটি উট এসে কদম মুবারকে মাথা রেখে ক্রন্দন করতে লাগল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এর সম্পর্কে কি কিছু বুঝতে পারছ, এ উটটি কি বলছে? তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কিছুই বুঝতে পারলাম না। নবীজী বললেন, সে তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলছে, আমি যখন রিষ্টপুষ্ট ছিলাম তখন মালিক আমার দ্বারা কাজ নিয়েছে, এখন বয়স হয়ে গেছে সে আমাকে জবাই করতে চায়। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জীবন বাঁচান। নবীজী মালিককে ডেকে বললেন, ভাই তোমার উট কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। মালিক বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এর সম্পর্কে যা বলবেন আমি তাই করব। নবীজী বললেন, একে ছেড়ে দাও, সাহাবী ছেড়ে দিলেন। একটি অবলা প্রাণীও নবীজীর দয়ার অংশ পেল। সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ্! অবলা একটি প্রাণী সেও নবীজীর নবুওয়তকে চিনল, বুঝল। কিন্তু তাঁর উম্মত হয়ে বুঝলাম না শুধু আমরা। এজন্যই আজ আমাদের এতো দুর্দশা।

মূসা নবীর জিজ্ঞাসা আমাদের শিক্ষা

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম একবার আল্লাহ্ তাআলার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া আল্লাহ্! আসমান -যমীন যদি আপনার আনুগত্য না করত তাহলে আপনি কি করতেন? আল্লাহ্ তাআলা বললেন, একটি জানোয়ার ছেড়ে দিতাম যা তাকে খেয়ে ফেলত।

ভায়েরা আমার! একটু চিন্তা করে দেখুন তো এ পৃথিবী কি বিশাল, সাত আসমান কত বিশাল বিস্তৃত। এগুলোকে যে জানোয়ার এক লোকমায় খেয়ে ফেলতে পারে সেটা কত সুবিশাল হবে, তার মুখ গহ্বর কত বিস্তৃত হবে! মূসা আলাইহিস সালাম এ উত্তর শুনে চমকে উঠলেন। ইয়া আল্লাহ্, কোথায় সে জানোয়ার? আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করলেন, আমার চারণভূমিতে চড়ে বেড়ায়। কোথায় সে চারণভূমি? বললেন, আমার ইলমের খাযানায়। সুবহানাল্লাহ যে জানোয়ার এত বড় তার চারণভূমি কত বড় হবে, আর কোথা হবে সে চারণভূমি। সবকিছুই আল্লাহ্‌পাকের গায়েবী নেযাম। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তা জানে না। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র জিনিষ থেকে নিয়ে আরশ পর্যন্ত সব কিছুই তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার স্রষ্টা হওয়ার গুণ প্রকাশিত হয়েছে।

সুন্দরী নারীর প্রশ্ন তুমি মানুষ না পাথর?

কোন এক যুদ্ধে হাবীব ইবনে উমায়ের নামক এক সাহাবী রোমানদের হাতে বন্দী হলেন। রোমান বাদশাহ তাকে বলল, তুমি যদি স্বধর্ম পরিত্যাগ কর আর যদি খৃষ্টান হয়ে যাও তাহলে আমার পরমা সুন্দরী কন্যার সাথে তোমার বিবাহ দেব এবং অর্ধেক রাজত্ব তোমাকে দিয়ে দেব। উমায়ের বললেন, তুমি যদি সমস্ত দুনিয়াও যদি দিয়ে দাও তবুও এটা অসম্ভব। বাদশাহ তখন কি করল, নিজের সুন্দরী কন্যা আর বন্দী সাহাবীকে নির্জন এক কক্ষে বন্ধ করে রাখল। মেয়েকে বলল, যেভাবেই হোক তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত কর, তাহলে অন্যসব কাজ সহজ হয়ে যাবে। তিন দিন তিন রাত সে মেয়ে নিজের যৌবন আর সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বন্দীকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতে থাকল। কিন্তু এ তিন দিনে এ সাহাবী এক মুহূর্তের জন্যও চোখ তুলে তার দিকে দেখলেন না যে, আমার সামনে কে।

এটা কিভাবে সম্ভব হল ভাই? হ্যাঁ, তারবিয়তের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমাদের যেহেতু সেভাবে তারবিয়ত করা হয় নি, আল্লাহ্র হুকুম মানার জন্য এভাবে অনুশীলন হয় নি। তাই আমাদের দৃষ্টিকোণ বাধা মানে না, নত হতে জানে না, শুধু উপরে উঠে যায়। কিন্তু তাঁরা শিখেছিলেন তাই একদিকে রোমের বিশ্ব সুন্দরী আর অপর দিকে আরবের মরুভূমির টগবগে দীপ্ত যৌবন, অন্য কেউ সেখানে নেই, তবুও হয়নি কোন স্খলন।

এ প্রসঙ্গে আপনাদেরকে একটি ছোট ঘটনা শোনাচ্ছি। একবার এক বুযুর্গ শয়তানকে স্বপ্নে দেখে বললেন, কোন রহস্যের কথা বলে দাও। শয়তান বলল, কখনো কোন বেগানা মহিলার সাথে যাবে না। মহিলা যদি হয় রাবেয়া বসরী আর পুরুষ যদি হয় জুনায়েদ বাগদাদী তবুও তাদেরকে গোমরাহ করার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে আমি উপস্থিত হবই।

পাঠক লক্ষ্য করুন! আর এখানে তিনদিন তিনটি রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময়ের মধ্যে সাহাবী সে পরমা সুন্দরীর দিকে চোখই উঠালেন না, তখন গোমরাহ করার সুযোগ কোথায়? পরিশেষে রোমান কন্যা নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠল যে, একি রক্ত মাংসে গড়া মানুষ না গাছ-পাথর!!

তাকবীরের এক হাঁকে এত শক্তি!

মুসলমানরা সিরিয়ার হিমস নগরী একবার অবরোধ করল। মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ। এ অবস্থায় পাদ্রীরা বলল, এসব মুসলমানের সাথে সন্ধি করে নেয়াই ভাল, কেননা এ পরিস্থিতিতে তাদের সাথে লড়াই করা অনর্থক। কেননা তারা শেষ নবীর সহচরবৃন্দ, তাদের সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্গের ভেতরে যেসব সৈন্য অবস্থান করছিল তারা বলল, না, আমরা সব কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছি। আমরা তাদেরকে দেখে ছাড়ব, তারা আমাদের সামনে কিছুই নয়। বাধ্য হয়েই হযরত আবু উবায়দা (রা.) অবরোধ আরোপ করে বললেন, আমি যখন তাকবীর বলব তখন তোমরা অজু করে মাল সামানা তৈরি করে ফেল এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকবে। তিনি শহরের নিকটবর্তী হয়ে যখন আল্লাহু আকবার বলে হুংকার ছাড়লেন, তখন সারা শহরে ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ল এবং মানুষ দিশেহারা হয়ে গেল। ভূমিকম্প হয়ে গেল, চার দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরল, ইটগুলো খসে খসে পড়ে গেল। তখন তাদের পাদ্রীরা বলতে লাগল, আমরা আগেই বলেছিলাম যে, মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করতে যেওনা। তাকবীরের এক হাকে এত শক্তি, তাহলে তারা তরবারী ধারন করলে কি অবস্থা দাঁড়াবে। ভাইয়েরা আমার! সে আল্লাহু আকবার আমরাও বলি। কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হয়না।

মেহনতের প্রথম ফল পরিবর্তন

আমেরিকায় আমাদের এক জামাআত গিয়েছিল। শিকাগোর এক মসজিদে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল। সেখানে যেয়ে দেখি মসজিদে তাঁবু লাগানো। এতে বড়ই আশ্চর্য হলাম। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, এ এলাকার সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ও মাফিয়া মুসলমান হয়ে গেছে এবং পাকিস্তানে যেয়ে তিন চিল্লা সময় লাগিয়েছে। সে জানতে পেরেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুতে থাকতেন, তাই এখানে মসজিদে তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন যাতে ২৪ ঘণ্টা না হলেও কমপক্ষে কয়েক ঘণ্টা এ তাঁবুতে কাটিয়ে যেন সে সুন্নাত আদায় করা যায়। বিশ্বাস করুন সেদিন বড়ই লজ্জিত হয়েছিলাম এ ভেবে যে, নতুন মুসলমান হয়ে তিনি

কিভাবে ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পর্যন্ত আকড়ে ধরেছেন। নিজের নামও রেখেছেন সে আবু বকর। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব হল ভাই? তারবিয়তের কারণে, তাবলিগী মেহনতের কারণে। তাবলিগের উদ্দেশ্যই এটা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিটি সুন্নাত আমাদের মধ্যে যিন্দা হয়ে থাক।

আহ্! সেটা কেমন নামায ছিলো

হযরত আনাস (রা.)-এর গোলাম এসে জানাল! বাগানের পানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। পানির ব্যবস্থা করা না গেলে গাছপালা সবই শুকিয়ে মারা যাবে। সেখানে নদী-নালা কিছু ছিল না, টিউবওয়েলও ছিল না। তিনি বললেন আচ্ছা জায়নামায নিয়ে এস। জায়নামায বিছালেন এবং দুই রাকাআত নফল পড়লেন, সালাম ফিরিয়ে গোলামকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু দেখা যায়? গোলাম বলল, না। তিনি আবার নামাযের নিয়ত বাঁধলেন। লম্বা কিরাআতে দুই রাকাআত পড়ে গোলামকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি কিছু দেখা যায়? গোলাম বলল জ্বি না হুজুর। কিছুই দেখা যায় না। তিনি তৃতীয়বারে আবার নামায শুরু করলেন। এবার যথারীতি নামায শেষ করে গোলামকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কিছু দেখা যায়? গোলাম বলল, আকাশে অনেক দূরে ছোট এক খণ্ড মেঘের মত দেখা যাচ্ছে। হযরত আনাস (রা.) আবার নামায শুরু করলেন এবং সালাম ফিরাতে না ফিরাতেই বাগানের উপর মেঘ ছেয়ে গেল। আর যেই সালাম ফিরালেন তখনই শুরু হল মুসলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি শেষ হলে গোলাম বলল, শুধুমাত্র বাগানের ভেতরেই বৃষ্টি হয়েছে, বাইরে এক ফোটাও হয় নি।

সারা দুনিয়ার উপর বাদশাহী করে এটাই হল আমার পরিণতি

তাযকিরায়ে কুরতুবী একটি প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম। তাতে একটি চমকপ্রদ কাহিনী উল্লেখ রয়েছে। এক খণ্ড জমি নিয়ে দুব্যক্তির মধ্যে লড়াই হচ্ছিল। একজন দাবী করছিল আমার, অন্যজন বলছিল আমার। মুখোমুখি হতে হতে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম হল। বিবাদের প্রথমটা সাধারণতঃ এ রকমই হয়, প্রথমে মুখ চলে পরে হাত চলে। কোন কোন সময় শেষে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। জমি যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকে। দাবীদার থাকে না। এটা একটা বড় শিক্ষার বিষয় ভাই। এতে দুইজনের মধ্যে তর্কাতর্কি হতে হতে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গেল। পাশে একটা ইট পড়েছিল আল্লাহ্ তাআলা এর যবান খুলে দিলেন।

সে আওয়াজ দিয়ে বলল, আরে ভাই তোমরা কি নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হলে? ইট বলল, আমি এক সময় এ দুনিয়ার বাদশাহ ছিলাম। দুনিয়ার বুকে রাজত্ব করেছিলাম। এরপর আমার মৃত্যু হলে আমাকে দাফন করা হল। এক সময় ভূমিকম্প হওয়ার কারণে উপরের মাটি নীচে আর নীচের মাটি উপরে চলে এল। এমন সময় এক কুমার এসে মাটি হয়ে যাওয়া আমার লাশ নিয়ে পানি গুলে কাদা তৈরী করল। পরে ছ্যাঁচে ফেলে বানাল ইট। আগুনে পুড়িয়ে সে ইট পাকা বানানো হল। পরে সে ইট দিয়ে দেয়াল তৈরী হয়ে গেল। কালের বিবর্তনে একসময় দেয়াল ভেঙ্গে ভগ্নস্তূপে পরিণত হল। ইটগুলো সব ছড়িয়ে পড়ল এদিক সেদিক। এরই এক ভগ্নাংশ হলাম আমি যা এখানে পড়ে আছে। সারা দুনিয়ার উপর বাদশাহী করে এটাই হল আমার পরিণতি। আর তোমরা সে জমির জন্য ঝগড়া করছ?

পশুরাও কথা বলে

হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) আছেম ইবনে উমর আনসারী (রা.)-কে মুসলমানদের সাহায্যার্থে পাঠালেন। বললেন, সেনাবাহিনীর জন্য রসদ সামগ্রী নিয়ে এসো।

ইরানীরা যখন খবর পেল যে, মুসলমানরা আমাদের দেশ আক্রমণ করবে তখন তারা নিজেদের গরু–ছাগলের পাল জংগলের ভেতর লুকিয়ে রাখল। মুসলমানরা যেয়ে দেখে সেখানে কোন গরু –ছাগল নেই। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই এখানে গরু –ছাগল কিছু কিনতে পাওয়া যাবে? আমাদের রসদ দরকার। তারা বলল, এখানে এসব কিছুই পাওয়া যাবে না। এমন সময় জংগল থেকে জানোয়ারগুলো চিৎকার করে বলতে লাগল, আমরা এখানে, আমরা এখানে। তোমরা আমাদেরকে নিয়ে যাও?। ইরানীরা আশ্চর্য হয়ে গেল এবং তাদের ধোঁকাবাজী ফাঁস হয়ে গেল।

যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সামনে এ ঘটনা বর্ণনা করা হল তখন সে বলল, এটা আমি বিশ্বাস করি না। লোকেরা বলল, সে বাহিনীর এক ব্যক্তি এখনও বেঁচে আছে, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। তাকে দরবারে ডেকে আনা হলে হাজ্জাজ বলল, শুনাও ভাই, ইরান আক্রমণের সময় কি ঘটনা ঘটেছিল।

সব ঘটনা তাকে শুনানো হলে হাজ্জাজ বলল, হ্যাঁ তখনই সম্ভব যখন পুরা লশকরের মধ্যে একজনও নাফরমান ছিল না। সে ব্যক্তি বললেন,

তাদের ভেতরের অবস্থাতো আমি বলতে পারব না কিন্তু তাদের বাহ্যিক অবস্থা এমনই ছিল যে, রাতে উঠে তাদের মত ক্রন্দনকারী আর কেউ ছিল না আর তাদের মত এমন দুনিয়া বিরাগীও কেউ ছিল না।

এ বাহিনীর তিন ব্যক্তির উপর সন্দেহ করা হয়েছিল যে, এদের নিয়ত মনে হয় ঠিক নেই। কেননা তারা একবার মুরতাদ হয়ে পরে আবার মুসলমান হয়েছিল। তারা হল কায়েস ইবনে মাকসু, উমর ইবনে মাদীকারাব, তালহা ইবনে খুওয়াইলিদ। তাঁরা প্রভাবশালী লোক ছিলেন। নবীজির ইন্তিকালের পর তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ পাক তাদেরকে আবার মুসলমান হওয়ার তাওফীক দিয়েছিলেন। কিন্তু রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত উমর (রা.) তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, রাতে তাদের মত ক্রন্দনকারী আর কেউ ছিলনা। আর তাদের মত পরহেযগারীও দ্বিতীয় কারো মধ্যে নেই। যাদের উপর সন্দেহ ছিল তাদের হল এ অবস্থা, তাহলে বাকিদের অবস্থা কি হবে অনুমান করা যায়?

নবীর দোয়ায় সবই সম্ভব

হযরত আলী (রা.) শীতকালে পাতলা কাপড় পরতেন আর গ্রীষ্মকালে পরতেন মোটা কাপড়। আবদুর রহমান ইবনে আবু ইয়ালা একদিন তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আব্বা! আমীরুল মুমিনীন সব সময়ই উল্টা কাজ করেন এর কারণটা কি? গরমকালে মোটা কাপড়, শীতকালে পাতলা কাপড়? পিতা বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করে তোমাকে বলব। এরপর তিনি হযরত আলীর কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা এরকম কথা বলাবলি করছে, মেহেরবাণী করে এর কারণটা বললে ভাল হয়। হযরত আলী (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি খয়বরের যুদ্ধের সময় আমার সাথে ছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ছিলাম। হযরত আলী (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিয়েছিলেন তখন আমার জন্য দুআ করেছিলেন, হে আল্লাহ্, তাকে ঠাণ্ডা এবং গরম থেকে হিফাযত কর।

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত না আমার শীত লাগে, না লাগে গরম। অতএব ভাই, আল্লাহ্ যাকে চান তার শীত দূর করে দিতে পারেন। শীত

নিবারণের জন্য মোটা কাপড়ের প্রয়োজন হয় না। আবার ইচ্ছা করলে কারো গরম দূর করে দিতে পারেন, এর জন্য পাখার বাতাস আর পাতলা কাপড়ের দরকার হয় না। ভেতর থেকেই ঠাণ্ডা-গরমের সিফাত বের করে নিতে পারে এবং আল্লাহ্ তাআলা এটা সকলের জন্যই করতে পারেন। কিন্তু এ দুনিয়া হচ্ছে আসবাবের দুনিয়া, মুজিযার দুনিয়া নয়। কারামতের দুনিয়া নয়। তাই বিশেষ কারো জন্য এসব ঘটনা ঘটে থাকে। সকলের জন্য নয়। এটা এজন্য হয় যেন আল্লাহ্র কুদরত মানুষের জন্য বুঝা ও শিক্ষার জন্য।

এতো খোশহালী জীবন আমার জন্য নয়

হযরত আয়েশা (রা.)-এর খিদমতে একবার একজন মেয়েলোক এসে দেখল নবীজীর লেপ পুরাতন ও ছেঁড়া-ফাটা। সে বলল আমি একটা নতুন লেপ দেব। ঘরে ফিরে সুন্দর ফুলওয়ালা একটা লেপ পাঠাল। এতে হযরত আয়েশা (রা.) খুবই খুশি হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তাশরীফ এনে দেখলেন, নতুন লেপ। কি ব্যাপার, কোথা থেকে এল এটা? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আপনার জন্য। আমার জন্য? জি হ্যাঁ আপনার জন্য। নবীজি বললেন, ফেরত পাঠিয়ে দাও। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ। আপনি পুরাতন, ছেড়া লেপে শয়ন করেন। এটা এর চেয়ে ভাল, আপনি এটা গ্রহণ করুন। নবীজী আবার বললেন, আয়েশা এটা ফেরত পাঠিয়ে দাও। হযরত আয়েশা (রা.) আবার অনুরোধ করলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আয়েশা! আমি চাইলে এ ওহুদ পাহাড় স্বর্ণ হয়ে আমার পায়ে গড়াগড়ি খেত, কিন্তু আমি দুনিয়াকে লাথি মেরেছি, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আর এ লেপ একই বিছানায় একত্রিত হতে পারে না। কাজেই এটা ফেরত পাঠিয়ে দাও।

নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে খোদায়ী নুসরত

এ জগতে রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্র। এখানে সেটাই হবে যা আল্লাহ্ চান। নমরুদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হল হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সাল্লামকে আগুনে জ্বালানোর জন্য। লাকড়ীর স্তূপ জমা করে এমনভাবে আগুন উত্তপ্ত করা হল যে, উপর দিয়ে কোন পাখি উড়ে গেলেও ছাই-ভস্ম

হয়ে আগুনে পড়ে যেত। যখন তাতে ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামকে নিক্ষেপ করার সময় হল, কিন্তু আগুনের কাছে যাওয়া কি সম্ভব। কোন রাস্তাই নেই। তারা হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামকে বলল, তুমি নিজেই চলে যাও। তিনি বললেন কেন আমি নিজে যাব। তোমাদের যদি আমাকে জালানোর ইচ্ছা থাকে তাহলে নিক্ষেপ কর। কিন্তু নিক্ষেপ করবে কিভাবে? আগুনের উত্তাপে যখন কাছেই ঘেষা যায় না। তখন সকলে বুদ্ধি করতে লেগে গেল। কিন্তু কোন বুদ্ধিই মাথায় এল না।

এমন সময় শয়তান এগিয়ে এল বুদ্ধি নিয়ে। চরকার মত একটা জিনিস বানিয়ে দিল। তাতে বসিয়ে নিক্ষেপ করলে আগুনের ভেতর যেয়ে পড়বে। তারা ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম-এর কাপড় চোপড় রশি দিয়ে খুব ভাল করে বাঁধল এবং যখন উপরে উঠানো হল আর চরকা ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়া হল তখন সারা দুনিয়া হায় হায় করে উঠল। আল্লাহ্‌র খলীলের আজ একি দুর্দশা। হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম ডান দিকে চলে এলেন, পানির ফেরেশতা চলে এলেন বাম দিকে। মাঝখানে হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম নিশ্চুপ নিরুদ্বিগ্ন। তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ। আমার প্রভুই আমার জন্যই যথেষ্ট। এছাড়া আর কোন কথা নেই। পানির ফেরেশতা অপেক্ষায় আছেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পেলেই পানি দিয়ে আগুন নিভিয়ে দেয়া হবে। হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালাম অপেক্ষায় আছেন যে, আমাকে বললেই আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম কারো কাছে কোন সাহায্য চাচ্ছেন না, তখন তাঁরা পেরেশান হয়ে গেলেন। আগুনে পড়লেই তো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কেননা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম তো এটাই জানেন যে, আগুনের মধ্যে দহন শক্তি আছে, জ্বালানোই এর কাজ। জিজ্ঞাসা করলেন হে ইব্‌রাহীম? আমার কোন প্রয়োজন আছে কি? ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম বললেন প্রয়োজন আছে কিন্তু তোমার নয় আল্লাহ্‌র। আগুনে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টি মাখলুক থেকে হটে গেল তখন আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি আগুনকে নির্দেশ দিলেন– يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا হে আগুন তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যাও, স্বস্তিদায়ক ঠাণ্ডা।

আর আল্লাহ্ তাআলা আগুনকে ঠাণ্ডা করে দিলেন এবং আগুনের লেলিহান শিখা তাঁর জন্য শীতল হয়ে গেল। মা যেমন বাচ্চাকে খাটের উপর শুইয়ে দেন তেমনই মমতার সাথে আগুনের কোলে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা আগুনকে বানিয়ে দিলেন স্বচ্ছ। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালাম-এর পিতা আযর যে তার জীবনের দুশমন এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত, যখন তার দৃষ্টিতে আগুনের এ অভাবনীয় দৃশ্য পড়ল তখন তার মুখ থেকে স্বতস্ফুর্ত ভাবেই বেরিয়ে এলো, হে ইবরাহীম! তোমার রবই প্রকৃত রব। এটাই চির সত্য।

অন্তরে যার দ্বীনের মুহাব্বত তাই তো হলো নবীর উম্মত

জুনায়েদ জামশেদের মত খ্যাতিমান গায়করা যাদের নাচে গানে বিশ্ব কাঁপে, তারা আজ চার মাস সময় লাগাচ্ছে তাবলীগে। কয়েকদিন আগে মুলতানের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসায় শত শত তালিবে ইলম আর উলামায়ে কিরামের সামনে তাঁর বয়ান হল, তাঁর বয়ান শুনে সব উলামায়ে কিরাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বুখারীর সবক গ্রণহকারী তালেবে ইলমরা কান্নায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। যার নাচে একদিন ষ্টেজ কম্পিত হত তারা আজ আল্লাহ্ রাসূলের দাঈতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কি অভাবনীয় পরিবর্তন।

আমি নিজে তাঁকে ফয়সালাবাদে দেখেছি। আমার মত এত বড় দাড়ি। আমার চেয়ে বড় পাগড়ী তাঁর মাথায়। আমি মসজিদে যেয়ে দেখি তিনি বয়ান করছেন, "আরে ভায়েরা আমি পাগল নই, চার বছরের বাচ্চা থেকে নিয়ে ৬০ বছরের বৃদ্ধের মুখে পর্যন্ত তার গান জারী ছিল। সে বলছিল, আমি পাগল হয়ে এদিকে আসিনি। যে জগতে ছিলাম সেটা ছিল ধোঁকার জগত। এখন আমি হাকীকতের সন্ধান পেয়েছি। এখন আমি গায়ক নই, নবীজীর একজন আদনা উম্মতী"। কেউ না কেউ মেহনত করেছে। যার ফল এভাবে প্রকাশিত হয়েছে, কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছে, তাঁকে দাওয়াত দিয়েছে। যখন ষ্টেজে গেছে, টুন টুন, গুন গুন করেছে, দুচার লাখে পকেট ভরে গেছে। সেসব ছেড়ে দুনিয়াকে লাথি মেরে এ পথে আসা কত আত্মত্যাগের ব্যাপার চিন্তা করুন!

আল্লাহ্ তায়ালা যা চান তাই হয়

আমি এক তাফসীরের কিতাবে পড়েছি, আল্লাহ্ তাআলা সেদিন যদি কারো উপর রহমত করতেন তাহলে সে মহিলার উপরই করতেন, যে নিজের কোলের শিশুকে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছিল একটু আশ্রয়ের আশায়।

সে ছুটতে ছুটতে উঁচু এক পাহাড়ে যেয়ে চড়ল যার চেয়ে আর উঁচু কোন পাহাড় ছিল না। কিন্তু পানি বৃদ্ধি পেতে পেতে সে পাহাড়ের চূড়ায়ও পৌঁছে গেল। পানি যখন মহিলার কোমর পর্যন্ত পৌঁছল তখন সে বাচ্চাকে উপরে তুলে ধরল। কিন্তু পানি যখন তার গর্দান পর্যন্ত পৌঁছল তখন সে বাচ্চাকে মাথার উপর তুলে নিল, যদি বাচ্চাটাকে বাঁচানো যায়। কিন্তু পানির ঢেউ বাচ্চাকেও ছাড়ল না আর তার মাকেও ছাড়ল না। এমনকি নূহ আলাইহিস সালাম-এর এক ছেলেকেও তাঁর সামনেই পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হল।

আযাব প্রেরণে কুদরতের ব্যবহার

তিন ব্যক্তি এক গুহায় আশ্রয় নিয়ে উপরে পাথর চাপা দিল যাতে সেখানে পানি প্রবেশ করতে না পারে। কিছুক্ষণ পর তাদের প্রবল পেশাবের বেগ হল, বাধ্য হয়ে তারা পেশাব করতে বসল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাদের পেশাব এমন ভাবে জারি করে দিলেন যে, পেশাব আর থামে না। তিনজনে পেশাব করেই যাচ্ছে, পেশাব আর শেষ হয় না। এক সময় এ পেশাবেই তাদের গুহা ভরে গেল আর নিজেদের পেশাবে ডুবে মারা পড়ল। পানি থেকে বাঁচতে যেয়ে পেশাবে ডুবে মারা গেল। ভাই যে গোনাহ করার কারণে কওমে নূহের উপর এ আযাব-গজব এসেছিল আজ সারা দুনিয়া কিন্তু সে গোনাহে ডুবে রয়েছে। কিন্তু আমরা আজও কওমে নূহের পরিণতির কথা স্মরণ করি।

আল্লাহ্‌র নাফরমানীর পরিণতি

তারা শুনেছিল যে, কওমে আদকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাই তারা পাহাড়ের ভেতর ঘর বানাল। কতদূরই বা যাবে। কিন্তু তারা নাফরমানী ছাড়ল না, নিজের মনমত চলতে লাগল। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা এবার হাওয়া পাঠালেন না, পাঠালেন মাত্র একজন ফেরেশতা। তারা এক চাল চেলেছিল। আল্লাহ্ বলেন আমিও এক পদ্ধতি অবলম্বন করলাম। ফেরেশতা এসে এক বিকট চিৎকার দিল। এমনই চিৎকার যে, এতে সকলেরই কলিজা ফেটে মারা গেল। এভাবে পুরা জাতি ধ্বংস হয়ে গেল। কেউ বাঁচতে পারল না।

অবাধ্যদের আল্লাহ্ তায়ালা এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।

পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ কোনটি উত্তম? অবৈধ নাকি তাকওয়া!

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ) এর ১২টি ছেলে ছিল। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তাঁর শ্যালক মাসলামা ইবনে আবদুল মালিক তাঁকে বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি কিন্তু সন্তানদের উপর বড় যুলুম করেছেন। তাদের জন্য যা কিছু রেখে যাচ্ছেন তা থেকে তারা প্রত্যেকে দুই দিরহাম করে পাবে। এ দুই দিরহাম দিয়ে তারা কি করবে? হযরত উমর বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। তখন বিষের ক্রিয়া পুরাদমে আরম্ভ হয়ে গেছে, তাঁকে উঠিয়ে বসানো হল। তিনি বললেন, শোন-আমি তাদেরকে হারাম কোন কিছু খাওয়াই নি। হারাম কোন কিছু তাদের জন্য রেখেও যাচ্ছি না। আর হালাল ছাড়া যেহেতু আমার কাছে কিছু নেই তাই আমি তাদের জন্য কোন কিছু রেখে যেতেও বাধ্য নই। মাসলামা বলল, আমি আমার পক্ষ থেকে এক লাখ দিরহাম দিচ্ছি, আপনি ছেলেদেরকে হাদিয়া করে দিন। আমিরুল মুমিনীন বললেন, তুমি পরিপূর্ণ ওয়াদা করছ? সে বলল হ্যাঁ। আমিরুল মুমিনীন বললেন, তুমি যুলুম করে এবং ঘুষ স্বরূপ যার যার কাছ থেকে এসব টাকা পয়সা সংগ্রহ করেছ তাদেরকে ফেরত দিয়ে দাও। আমার বাচ্চাদের তোমার পয়সার প্রয়োজন নেই। এরপর বললেন, আমার ছেলেদেরকে ডাক, সকলকে ডাকা হলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, প্রিয় সন্তানেরা আমার! আমার সামনে দুটি রাস্তা ছিল। একটা হল এটাই, আমি তোমাদের জন্য সম্পদ জমা করতাম চাই তা হালাল হোক বা হারাম, কিন্তু এর পরিণামে আমাকে জাহান্নামে যেতে হত। দ্বিতীয় রাস্তা হল, আমি তোমাদেরকে তাকওয়া পরহেযগারী শিখাতাম, আল্লাহ্ থেকে নেয়া শিখাতাম, পরিণামে জান্নাতে যেতাম। সন্তানেরা আমার! আমি তোমাদের পিতা, জাহান্নামের আগুন বরদাশত করার ক্ষমতা আমার নেই, তাই আমি তোমাদেরকে হারাম খাওয়াইনি, তোমাদের জন্য হারাম মাল একত্রিত করিনি বরং দ্বিতীয় রাস্তা তোমাদের জন্য অবলম্বন করেছি। তোমাদেরকে তাকওয়া শিখিয়েছি। সুতরাং যখন তোমাদের কোন কিছু প্রয়োজন পড়বে তখন আমার আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে। আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা আছে তিনি নেককারদের বন্ধু। তিনি নেককারদের সাথে আছেন।

এরপর শ্যালককে বললেন, মাসলামা! আমার এ সন্তানরা যদি নেক পথে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আর যদি এরা নাফরমান হয়ে যায় তাহলে তাদের ধ্বংসে আমার কোন আফসোস নেই।

এর পরে এমন দিন এসেছে, আসমান-যমীন দেখেছে যে, মাসলামা ইবনে আবদুল মালেক এবং সুলাইমান ইবনে আবদুল মালেকের ছেলেরা যাঁরা ছিল শাহজাদা, যারা প্রত্যেকে দশ দশ লাখ দিরহাম মীরাস পেয়েছিল

তাদের সন্তানেরা মসজিদের সিড়িতে বসে ভিক্ষা করছে। যেমন নাকি আজকাল জুমার দিন দেখা যায়। অপরদিকে উমর ইবনে আবদুল আযীযের ছেলেরা এক এক মজলিসে আল্লাহ্র রাস্তায় এক একশত ঘোড়া সদকা করে দিয়েছে।

অএব দেখুন ভাইয়েরা! আল্লাহ্র অনুগতদের মর্যাদা কত বিরাট?

আল্লাহ্কে যত দেয়া যায় ততই লাভ

হযরত উসমান গনী (রা.)-এর কাছে এক প্রার্থী এল। আসলে এসেছিল নবীজীর কাছে। তিনি পাঠিয়ে দিলেন হযরত উসমানের কাছে। তখন হযরত উসমান (রা.) স্ত্রীর সাথে তর্ক করছিলেন এবং বলছিলেন রাতে তুমি চেরাগে মোটা সলতে দিয়ে দিয়েছ যার কারণে তেল বেশী খরচ হয়েছে। একথা শুনে প্রার্থী ভাবল এ কেমন বখীলের কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, যে কিনা সলতে একটু মোটা দেয়ার কারণে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করছে। সে আমাকে আর কি দেবে।

তবুও আওয়াজ দিয়ে বলল, জনাব, নবীজীর দরবার থেকে এসেছি কিছু হাজত আছে। হযরত উসমান (রা.) ঘরে যেয়ে দিরহাম ভর্তি একটি থলে এনে তার হাতে দিলেন, জিজ্ঞাসাও করলেন না কত টাকার প্রয়োজন তোমার। কত হলে দরকার মিটবে। সে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল জনাব একটি কথার উত্তর দিন। হযরত উসমান (রা.) বললেন, বল কি কথা। সে বলল, আমাকে এত দিলেন যে, আমার পরবর্তী বংশধরের জন্যও যথেষ্ট। অথচ নিজে স্ত্রীদের সাথে তর্ক করছিলেন চেরাগে মোটা সলতে দিয়েছে বলে। এর রহস্য কি? হযরত উসমান (রা.) হেসে বললেন, সেটা ছিল নিজের খরচের ব্যাপার। নিজের খরচের সময় হিসাব করে খরচ করতে হয় আর এখানে আল্লাহ্কে দিলাম। তোমাকে দিই নাই, আল্লাহ্কে যত দেয়া যায় ততই লাভ।

আল্লাহ্কে ঋণ দেয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের পথ পরিষ্কার রাখ।

সারা জীবন গানের আসরে সর্ব শেষে কালিমা নিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে

হযরত উমর (রা.) এর কালের ঘটনা। সেকালে এক গায়ক ছিল। সে লুকিয়ে লুকিয়ে গান গাইত। গান-বাজনা হারাম বলে মানুষের সামনে খোলামেলা গাইত না। লুকিয়ে লুকিয়ে যারা তার গান শুনত তারাও তাকে কিছু পয়সা দিত। যখন সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল তখন তার আওয়াজ শ্রুতিকটু

হয়ে পড়ল। এখন আর গাইতে পারে না। তখন শুরু হয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ক্রমাগত আক্রমণ। অবশেষে জান্নাতুল বাকির পেছনে গিয়ে নিরিবিলি বসে পড়ল এবং বলতে লাগল–হে আল্লাহ্! যখন আমার সুমিষ্ট আওয়াজ ছিল, সুমধুর কণ্ঠ ছিল তখন মানুষ আমার গান শুনত। এখন আমার কণ্ঠ হারিয়ে গেছে এতে আমার শ্রোতারাও হারিয়ে গেছে। এখন আমার কণ্ঠ শোনার কেউ নেই। অথচ তুমি সকলের কণ্ঠই শোন। তুমি জান, আমি দুর্বল। তুমি জান আমি তোমার অবাধ্য। এরপরও আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার অভাবকে দূর করে দাও। এ কথা বলে সে এমন জোরে চিৎকার করল, তার কণ্ঠ গিয়ে পৌঁছল আল্লাহ্র দরবারে। মসজিদে শায়িত অবস্থায় ছিলেন হযরত উমর (রা.)। তাঁর কাছে নির্দেশ এল– আমার বান্দা আমাকে ডাকছে। তুমি তাকে সাহায্য কর। হযরত উমর (রা.) নাঙ্গা পায়ে ছুটে গেলেন জান্নাতুল বাকিতে। সেখানে গিয়ে দেখলেন একজন দুর্বল, বয়সের ভারে ন্যূজ্ব বৃদ্ধ বিড়বিড় করে আল্লাহ্কে তার জীবন কাহিনী শোনাচ্ছে। কিন্তু সে হযরত উমর (রা.) কে দেখেই ওঠে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। হযরত উমর (রা.) তাকে ডেকে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি তোমাকে ধরতে আসিনি। আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। বৃদ্ধ ফিরে তাকাল। বলল, কে পাঠিয়েছে? উমর (রা.) বললেন, তুমি যাকে ডাকছ তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। একথা শোনতেই বৃদ্ধ আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বলল, হে আল্লাহ্! সত্তরটি বছর তোমার অবাধ্যতায় কাটিয়েছি, তোমাকে কখনো স্মরণ করিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে স্মরণ করলাম, তাও পেটের তাগাদায়। এরপরও তুমি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ! হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। এ কথা বলেই সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল এবং এ কান্নার ভেতর দিয়েই সে মহান মালিকের সাথে গিয়ে মিলিত হল। হযরত উমর (রা.) নিজে তাঁর জানাযা পড়ালেন।

আল্লাহ্ কিভাবে মেনে নিবেন?

এক মহিলা হযরত আবদুর কাদের জিলানী (রহ.)-এর দরবারে এসে আরয করল, হযরত! যদি আল্লাহ্র তাআলার পক্ষ থেকে পর্দার নির্দেশ না থাকত তাহলে আমি আপনাকে আমার চেহারা খুলে দেখাতাম। আমি দেখাতাম আমি কতটা রূপসী। অথচ এরপরও আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। উপস্থিত সকলেই বিষ্ময়ে বিমূঢ়। বিষয়টা কি?

একজন মহিলা সে তার অভিযোগ নিয়ে এসেছে। সে তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা বলেছে। এতে বেহুশ হয়ে পড়ার কি আছে। কিছুক্ষণ পর যখন হুঁশ ফিরে পেলেন তখন সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শোন! এ একজন সাধারণ সৃষ্টি। একজন রূপসী নারী। অথচ সেও তার ভালবাসায় কোনরূপ অংশীদারিত্ব মানতে নারাজ। তাহলে তোমরাই বল, আল্লাহ্ তাআলা কিভাবে তাঁর ভালবাসায় কোন অংশীদারকে মেনে নিবেন? তিনি কত যে মহিমাময়! সৃষ্টি হয়ে আমরা অংশীদারকে মানতে পারি না। অথচ তিনি মেনে নিচ্ছেন। আমরা আমাদের হৃদয়ে কত অংশীদার বসিয়ে রেখেছি। তিনি সবই মেনে নিচ্ছেন এবং ক্রমাগতই।

নামাযে অমনোযোগিতা–চল্লিশ বছরের বিচ্ছেদ

হযরত ইউসুফ (আ.) কে তাঁর বাবা চল্লিশ বছর বিচ্ছেদে রেখেছেন। চল্লিশ বছর পর পিতা-পুত্রের মিলন হচ্ছে। হযরত ইয়াকুব (আ.) পুত্র শোকে কাঁদতে কাঁদতে চোখ অন্ধ করে ফেলেছিলেন।

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ -

শোকে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। (সূরা ইউসুফ : ৮৪)

যখন মিলন ঘটল তখন হযরত ইয়াকুব (আ.) আল্লাহ্র তাআলার দরবারে আরয করলেন– হে আল্লাহ্ ! এ দীর্ঘকাল তুমি কেন ইউসুফকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলে? ইরশাদ হল–একবার তুমি নামায পড়ছিলে। ইউসুফ ছিল তখন খুবই ছোট। সে তখন বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। আর তখন তোমার মনোযোগ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ইউসুফের প্রতি নিবিষ্ট হয়েছিল। তোমার এ আচরণ আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হেনেছে। এ কারণেই আমি ইউসুফকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

গোমরাহীর গর্ত থেকে হেদায়েতের উচ্চাসনে

একজন বিরাট বুযুর্গ ছিলেন হযরত রাবি ইবনে খুফফাইন (রহ.)। তাঁর কালের কিছু লোক তাঁকে অত্যন্ত হিংসা করত। সেকালে এক ব্যভিচারী নারী ছিল। রূপে-গুণে ছিল অতুলনীয়। হিংসুকরা তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে রাজি করাল সে হযরত রাবি' (রহ.) কে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। মানবতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফিতনার সূচনা হয়েছিল নারী থেকে। বিশেষ করে নারী ও পুরুষরা যখন স্বাধীনভাবে মেলামেশা

করে তখন শয়তান ফিতনা উস্কে দেয়। তাছাড়া ধন-সম্পদও মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। যেমনটি আজকের সমাজের প্রতি তাকালেই আমরা দেখতে পাব। এরপর সে ব্যভিচারীণি তার সব চাইতে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করল। খুব ভালভাবে সাজগোজ করল। শরীরে সুগন্ধি মাখাল। এরপর হযরত রাবি' ইবনে খুফফাইন (রহ.) যখন রাতের বেলা নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হলেন তখন সে রূপসী নারী তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তুলে দিল মুখের পর্দা। তার উপর হযরত রাবি (রহ.) এর দৃষ্টি পড়তেই তিনি সাথে সাথে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বললেন, শোন বোন! যে সৌন্দর্য নিয়ে তোমার এত অহংকার, যে রূপের ভরসায় তুমি আমাকে পথহারা করতে এসেছ, তুমি একবার সে দিনের কথা স্মরণ কর যেদিন আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে কোন অসুস্থতায় আক্রান্ত করবেন। বল, সে দিন তোমার চেহারার ঔজ্জ্বল্য কোথায় যাবে? তোমার শরীরের হাড়গুলো যখন কংকালের মত বেরিয়ে আসবে বল, সেদিন তোমার রূপ যাবে কোথায়? তুমি বল, যখন তোমাকে কবরে রাখা হবে, যখন তোমার এ আলোকজ্জ্বল মুখের ওপর মাটি ছড়িয়ে দেয়া হবে, যখন তোমার শরীরের ওপর কবরের পোকা–মাকড় অবাধে ঘুরে বেড়াবে। তোমার চোখগুলো খেয়ে ফেলবে, তোমার চুলগুলো টেনে উপড়ে ফেলবে, তোমার হাড়গুলো শরীর থেকে আলাদা হয়ে পড়বে– তখন তো তুমি হবে একটি নিথর কংকাল। তুমি একবার সে দিনের কথা ভেবে দেখ, যেদিন তোমাকে মুনকার–নাকীর তুলে বসাবে। এরপর তোমাকে তোমার কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। বল, কি রূপ নিয়ে আজ তুমি বড়াই করছ? তোমার এরূপ সৌন্দর্য কাল-ই পোকা-মাকড়ের খোরাক হবে।

হৃদয়ের দরদ ও ব্যথা বিজড়িত একেকটি বাণী ব্যভিচারী নারীর হৃদয়ে আঘাত করছিল এবং তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পথহারা করতে আসা নারী নিজেই বেহুঁশ হয়ে পড়ল পথের উপর। এরপর যখন সে হুঁশ ফিরে পেল তখন সাথে সাথে তাওবা করে। পরবর্তীকালে সে তার কালের অনেক বড় ওলী ও তাপসী হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেছিল। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তাঁর কাছে দু'আ চাইতে আসত।

নবীপ্রেমের অনুপম দৃষ্টান্ত

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর ওফাতের পর একবার এক নারী এসে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর ঘরে উপস্থিত

হয়ে আরয করল- আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কবর মুবারক যিয়ারত করতে চাই। হযরত আয়েশা (রা.) হুজরা মুবারকের দরজা খুলে দিলেন। আর সে ভক্ত নারী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। আর কাঁদতে কাঁদতে এ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করল। ধন্য সে মহিলার জীবন আর নবী প্রেমের অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর বিবাহ প্রস্তাব

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর স্বামী মারা গিয়েছিলেন যৌবনে। হাসান বসরী (রহ.) ছিলেন সে কালেরই এক মহান ব্যক্তিত্ব। ইসলামী জ্ঞান ও বুযুর্গীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে কালের বহু মানুষ তাঁর কাছে কন্যা দেয়ার জন্য লালায়িত ছিল। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (রহ.) নিজে পায়ে হেঁটে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)-এর দরবারে হাজির হন। পর্দার আড়াল থেকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। জবাবে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বলেন, যদি আমাকে চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করব। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, বলুন আপনার প্রশ্ন। রাবেয়া বসরী (রহ.) বললেন, বল আমি কি জান্নাতী না জাহান্নামী। হাসান বসরী নিরব। প্রশ্ন করলেন, হাশরের মাঠে যখন আমলনামা বিতরণ করা হবে তখন কেউ আমলনামা পাবে সামনে থেকে, কেউ পিছন থেকে। বল, আমি কোন দিক থেকে পাব? হাসান বসরী নীরব। প্রশ্ন করলেন, কিয়ামতের দিন যখন আমল মাপা হবে তখন কারও নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে কারও বদ-আমলের। বল আমার কি হবে? হাসান বসরী নীরব। প্রশ্ন করলেন, যখন পুলসিরাত পার হওয়ার পালা আসবে তখন কেউ কেউ বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে কেউবা পড়ে যাবে। বল, আমার অবস্থা কি হবে? হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, রাবেয়া! আপনার কোন প্রশ্নের জবাবই আমার কাছে নেই। উত্তরে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বললেন, হাসান! যাও, আমাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ দাও। আমার সামনে বড় বিপজ্জনক ঘাঁটি রয়েছে। বিয়ে করার সময় আমার নেই।

দিলাম শুধু আটা ফেরত এলো গোশতসহ রুটি অপূর্ব প্রতিদান

এক ওলীর স্ত্রী আটার খামিরা তৈরি করে প্রতিবেশীর ঘরে গেছেন আগুন আনতে। এদিকে এক ফকীর এসে আল্লাহ্‌র নামে হাঁক দিয়েছে। ঘরে তখন সে সামান্য খামিরা করা আটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই

মাখানো আটাটুকুই তিনি ফকীরের হাতে তুলে দিলেন। স্ত্রী আগুন নিয়ে এসে যখন দেখলেন নির্দিষ্ট স্থানে আটা নেই, তখন স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, আটা কোথায়? স্বামী বললেন, এক বন্ধু এসেছিল। তাকে রুটি তৈরি করার জন্য আটাগুলো দিয়ে দিয়েছি। স্ত্রী কিছু সময় অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কেউ আসছে না। অবশেষে বললেন, মনে হয় আটাগুলো দান করে দিয়েছেন। ওলী বললেন, হ্যাঁ। স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দা! অন্তত একটি রুটি পরিমাণ আটা রেখে দিতেন! দুজনে ভাগ করে খেয়ে নিতাম। বুযুর্গ বললেন, আমি খুবই ভাল বন্ধুকে দিয়েছি। চিন্তা করবে না। কিছুক্ষণ পরই দরজায় আওয়াজ শোনা গেল। বুযুর্গ ওঠে গেলেন। দেখলেন তাঁর বন্ধু উপস্থিত এবং এক হাতে গোশত বোঝাই একটি পেয়ালা, আরেক হাতে রুটি বোঝাই একটি পাত্র। বুযুর্গ হাসতে হাসতে ভেতরে আসলেন। বললেন, দেখ! আমি আমার খালি আটা দিয়েছিলাম। আমার বন্ধু এমন দয়ালু, তিনি রুটি তৈরি করে এর সাথে গোশত রান্না করে পাঠিয়েছেন।

ত্রিশ দিরহামের বিনিময়ে তিনশত দীনার

এক ভিক্ষুক হযরত আবু উমামা বা'লী (রহ.)-এর দুয়ারে উপস্থিত। তখন তাঁর কাছে ত্রিশটি দিরহাম ছিল। ভিক্ষুক আল্লাহ্‌র নামে চাইতেই ত্রিশটি দিরহাম তিনি ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিলেন।তাঁর ঘরেই এক দাসী ছিল খৃষ্টান। হযরত আবু উমামা (রহ.) ছিলেন রোযা। এ কাণ্ড দেখে দাসীটি খুবই ক্ষুব্ধ হল। সে বলে, ঘটনাটি দেখে আমার মনে খুব রাগ হল। আল্লাহ্‌র বান্দা সব গুলো পয়সা ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিল। নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না, আমাদের জন্যও কিছু রাখলেন না। অথচ নিজে রোযাদার। নিজেও ক্ষুধায় মরল, আমাদেরকেও ক্ষুধায় রাখল। দিন গড়িয়ে যখন আসরের সময় হল তখন আমার মনের ভেতর তাঁর প্রতি দয়ার উদয় হল। ভাবলাম, আল্লাহ্‌র নেক বান্দা। রোযা রেখেছেন। আচ্ছা, আমিই তাঁর ইফতারের ব্যবস্থা করি। আমি প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে কিছু খাবার ধার করলাম এবং ইফতারির ব্যবস্থা করলাম। এরপর যখন তাঁর বিছানা ভাঁজ করতে গেলাম তখন তাঁর মাথার কাছে দেখি তিনশ'টি দিনার পড়ে আছে। আমি তখন বললাম, আচ্ছা কাণ্ড! এজন্যই সবগুলো দিরহাম দান করে দিয়েছেন! আর দিনারগুলো এখানে লুকিয়ে রেখেছেন! আমাকে বলেওনি।

সন্ধ্যায় যখন হযরত আবু উমামা (রহ.) ঘরে ফিরলেন তখন সে বলল, আপনি এতগুলো পয়সা এখানে রেখেছেন তা আমাকে বলবেন না? আমি

মনে করেছি ঘরে কিছুই নেই। তাই প্রতিবেশীর কাছ থেকে খাবার ধার করেছি। ঘরে যখন পয়সা ছিল তখন আমি বাজার করেই আনতে পারতাম। বুযুর্গ বললেন, পয়সা কোথায়? বলল, এই যে আপনার মাথার কাছে বালিশের নিচে। বুযুর্গ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখানে একটি পয়সাও ছিল না। দাসীটি বললেন, তাহলে প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে।

আল্লাহ্ তায়ালার লজ্জাবোধ

ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম (রহ.) ছিলেন একজন অনেক বড় মুহাদ্দিস। তিনি মারা গেলেন। বেঁচে থাকতে তিনি স্বভাবগতভাবে ছিলেন খুবই রসিক। হাসি তাঁর মুখে লেগেই থাকত। অথচ ছিলেন সমকালীন সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস। তিনি ইন্তিকাল করার পর এক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখল। দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস কর– আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করালেন এবং বললেন, আরে পাপী বুড়ো! তুমি এ করেছ, সে করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্! আমি আপনার সম্পর্কে এমনটি শুনিনি যেমনটি আপনি বলছেন।

তাঁর ইলমের অবস্থা দেখুন! আল্লাহ্ তাআলার সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যেমনটি বলছেন, আপনার সম্পর্কে তো আমি তেমনটি জানতাম না! আল্লাহ্ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার সম্পর্কে কি শুনেছ?

তিনি বললেন–

حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْمَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ زُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ جِبْرَائِيْلَ قَالَ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ اَسْتَحْيِىْ اَنْ اُعَذِّبَ شَيْبَةً فِى الْاِسْلَامِ - وَاَنْتَ شَيْبَةٌ فِيْهِ الْاِسْلَامِ -

হে আল্লাহ্! আমি আপনার সম্পর্কে যা শুনেছি তা পূর্ণ দলীলসহ আপনাকে শোনাচ্ছি। আমাকে আবদুর রাযযাক বলেছেন, তাঁকে বলেছেন মা'মার তাঁকে বলেছেন যুহরী, তাঁকে বলেছেন ওরওয়া ইবনে যুবায়ের তাঁকে বলেছেন খালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), তাঁকে বলেছেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁকে বলেছেন জিবরাইল

(আ.) যে, আল্লাহ্ তাআলা নিজ মুখে বলেছেন– যখন কোন মুসলমান বুড়ো হয়ে মারা যায় তখন আমি তাকে শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করি। হে আল্লাহ্! তুমি দেখতেই পাচ্ছ আমি বুড়ো হয়েই তোমার কাছে এসেছি। তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন–

صَدَقَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَصَدَقَ مَعْمَرٌ وَصَدَقَ زُهْرِىٌّ وَصَدَقَ عُرْوَةُ وَصَدَقَتْ عَائِشَةُ رَض وَصَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَدَقَ جِبْرَائِيْلُ قَالَ، وَاَنَا اَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ -

আবদুর রাযযাক সত্য বলেছে।

মা'মার সত্য বলেছে।

যুহরী সত্য বলেছে।

ওরওয়া সত্য বলেছে।

আয়েশা সত্য বলেছে।

আমার প্রিয় নবী সত্য বলেছেন।

জিবরাইল সত্য বলেছে। আর আমি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী। যাও গিয়ে আনন্দ কর। জান্নাতে যাও, জান্নাত উপভোগ কর।

দুনিয়ামুখী মানুষের অবস্থা

ওয়াসে বিল্লাহ। এক বিখ্যাত জালিম বাদশাহ। তার চোখে চোখ রেখে কেউ কথা বলতে সাহস করত না। তার চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়ত। তাকে যখন মৃত্যু এসে ঝাপটা দিয়ে ধরে তখন সাথে সাথে আকাশে দুই হাত তুলে মিনতি জানায় –

يَامَنْ لَا يَزَالُ مُلْكُهُ، اِرْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ -

"হে অবিনশ্বর রাজত্বের অধিপতি! সেই অসহায়ের প্রতি করুণা কর যার রাজত্ব হারিয়ে গেছে।"

কত প্রতাপ-তেজী শাসক। যার চোখে চোখ রেখে সমকালীন কোন শক্তি কথা বলার হিম্মত করেনি। অথচ মৃত্যুর পর যখন তার শরীর ঢেকে দেয়া হল সাদা কাপড়ে। হঠাৎ করেই চাদরের নিচে নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেল। উপস্থিত সকলেই তাজ্জব! কি নড়ছে চাদরের নিচে? যখন চাদর সরানো হল এবং দেখা গেল, নাদুস-নুদুস একটি ইঁদুর। সে ওয়াসেক

বিল্লাহর টগবগে চোখ দুটি খেয়ে ফেলেছে। সকলেই বিস্মিত। এ আব্বাসী রাজমহলে ইঁদুর প্রবেশ করল কিভাবে? যে রাজমহল আটত্রিশ হাজার পর্দায় আবৃত। যে রাজমহল স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া পর্দাবেষ্টিত। যে রাজমহলে হীরা-মোতি এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হত যেভাবে আঙ্গুর বাগানে আঙ্গুরের থোকা ঝুলে থাকে। আব্বাসী রাজমহলে পিঁপড়ে প্রবেশ করাও মুশকিল। কিন্তু সেখানে ইঁদুর প্রবেশ করল কিভাবে? তাও আবার বাদশাহ ওয়াসেক বিল্লাহর শয়নকক্ষে। মূলত এ ইদুর পাঠিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। পাঠিয়েছেন জগতবাসীকে একথা জানিয়ে দেয়ার জন্য, হে পৃথিবীবাসী! তোমরা দেখে নাও, যে চোখ থেকে প্রতাপ ঝরে পড়ত, তোমরা দেখ সে চোখকেই সর্বপ্রথম সোপর্দ করা হল একটি ইঁদুরের হাতে। এ থেকেই বুঝে নাও, কবরে তার সাথে কি আচরণ করা হবে? কবরে সে কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে।

দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী

এক সুন্দর সুপুরুষ ছিলেন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক। তিনি প্রতিবার চারজন নারীকে এক সাথে বিয়ে করতেন। এরপর এ চারজনকে এক সাথে তালাক দিয়ে পুনরায় চারজন বিয়ে করতেন। এর বাইরে দাসী ছিল সারি সারি। অথচ নারীলোভী এ বাদশাহ মৃত্যুবরণ করে মাত্র পয়ঁত্রিশ বছর বয়সে। জীবনের চল্লিশটি বছরও পূর্ণ করতে পারেনি। অথচ এ দুনিয়ার সুখ-ভোগ নিয়ে তার স্বপ্নের অন্ত ছিল না। এর বিপরীতে উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ) কে দেখুন, তিনিও তাঁর জীবনের এক চল্লিশ বছর পূর্ণ করতে পারেননি। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পার্থক্য দেখুন, যখন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিককে কবরে রাখা হল তখন তার শরীর নড়ে উঠল। তার পুত্র বলল, আমার বাবা জীবিত। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বললেন–

عَجَّلَ اللّٰهُ بِالْعُقُوْبَةِ۔

বেটা! তোমার বাবা জীবিত নয়। বরং আযাব দ্রুত শুরু হয়ে গেছে।

সুতরাং তাকে দ্রুত দাফন কর। দৃশ্যত সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক ছিলেন বনু উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সুন্দরতম শাহাজাদা। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বলেন, আমি নিজে তাকে কবরে নামিয়েছি। যখন তার চেহারা থেকে কাপড় সরালাম দেখলাম, তার চেহারা কিবলার দিক থেকে সরে গেছে। তার রঙ হয়ে গেছে ছাই বর্ণের।

কবরের গরম যখন কাউকে স্পর্শ করে তখন তার হাড়গুলো মোমের মত গলে যায়। শরীর ছাই হয়ে যায়। সুন্দর মুখ মায়াবী চোখ সবকিছুই ভস্ম হয়ে যায়।

এক সাথে হাসি-কান্নার রহস্য

এক বিখ্যাত তাপসী নারী হযরত মুআযা আদাবিয়া (রহ.)। বর্ণিত আছে, প্রতিটি রাতের সূচনাতেই তিনি নিজেকে নিজে এ বলে প্রস্তুত করতেন, হে মুআযা! এটাই তোমার জীবনের সর্বশেষ রাত। আগামীকালের সূর্য দেখা তোমার ভাগ্যে আর জুটবে না। কিছু যদি করতে চাও তাহলে এ রাতেই করে নাও।

এরপর মুসল্লায় বসে পড়তেন ইবাদত করতে করতে মুসাল্লায় ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার জেগে ওঠতেন আবার ডুবে যেতেন ইবাদতে। নিজেকে আবারও শুধাতেন, এ রাতই তোমার শেষ রাত। আগামীকালের সূর্যোদয় হয়তো তুমি দেখবে না। যদি কিছু করতে হয় এখনই করে নাও। এভাবে সারা রাত নিমগ্ন থাকতেন ইবাদতে। যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং মুহূর্তে আবার হাসতে লাগলেন। উপস্থিত মহিলারা জিজ্ঞেস করল, কাঁদলেন-ই বা কেন আবার হাসলেন-ই বা কেন?

তিনি বললেন, কেঁদেছি এজন্য– আজ থেকে আমি আর কখনও নামায পড়তে পারব না, রোযা রাখতে পারব না। নামায রোযার এ বঞ্চনা চিন্তা আমাকে কাঁদতে বাধ্য করেছে। আর হেসেছি এজন্য– (তাঁর স্বামী ছিলেন একজন উচুস্তরের তাবেঈ। নাম ছিল সিলআ ইবনুল উশাইম (রহ.)। তিনি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদতবরণ করেছিলেন।) আমার স্বামী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে বলছে, তোমাকে নিতে এসেছি। এ কারণে হাসছি। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আমার স্বামীর সাথে মিলিত করেছেন। তিনি আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। আর আমার দিকে হাত প্রসারিত করেছেন– তোমাকে নিতে এসেছি। একথা বলেই তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ফিরাউনের দাসীর ঈমানী শক্তি

ফিরাউনের এক দাসী ছিল। সে গোপনে গোপনে মসলমান হয়ে গিয়েছিল। টাকা-পয়সা যেমন লুকানো থাকে না, ইসলামও তেমনি লুকিয়ে রাখা যায় না। কৃপণ ব্যক্তির পক্ষে হয়তো টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু ঈমান কারও পক্ষেই লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। তাই ধীরে ধীরে

দাসীর ঈমানের কথা ফেরাউনের কানে গিয়ে পৌঁছল। ফিরাউন তাকে ডেকে পাঠায়। তার ছিল ছোট দুই কন্যা। একজন ছিল দুগ্ধপায়ী শিশু। ফিরাউন একটি বড় পাত্রে তেল ঢেলে গরম করতে নির্দেশ দিল। এরপর তেল যখন ফুটন্ত হয়ে ওঠে তখন দাসীকে বলে, যদি তুমি আমাকে খোদা না মান তাহলে তোমার সন্তান এখনই তোমার থেকে বিদায় নেবে। যদি তুমি মূসার খোদাকে খোদা মান তাহলে আমি প্রথমে তোমার দুই কন্যাকে এ ফুটন্ত তেলে পুড়িয়ে মারব, এরপর মারব তোমাকে। দাসী বলল, আমার দুইজন মেয়ে মাত্র। যদি আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকত তাহলে সে মেয়েকেও আমি আল্লাহ্‌র রাহে বিসর্জন দিতাম। সুতরাং তুমি যা কিছু করতে চাও করতে পার। আমি এর প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছেই চাইব।

ফিরাউন বড় মেয়েটিকে তুলে নিয়ে ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দিল। মায়ের চোখের সামনে তার নাড়ী ছেঁড়া ধন সন্তান পুড়ে ভূনা হয়ে গেল। এ দৃশ্য কি মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব! এ ভাব ব্যক্ত করতে পৃথিবীর সকল ভাষা অক্ষম। এখানে এসে বুঝি পৃথিবীর সকল ভাষা ও সাহিত্যই বোবা হয়ে যায়! হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ভাষা অক্ষমতা প্রকাশ করে। বেদনা ব্যক্ত করা যায় না।

আল্লাহ্‌র রহমত তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। সরে যায় মায়ের চোখের সামনে থেকে পার্থিবতার পর্দা। অদৃশ্য দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মা পরিষ্কার দেখত পায় তার কন্যার আত্মা তার শরীর থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে বলে যাচ্ছে মা ধৈর্য ধর। জান্নাতে দেখা হবে।

এরপর ফিরাউন তার বুক থেকে তার দুগ্ধপায়ী শিশুটিকে কেড়ে নেয়। দুধের শিশুর সাথে মায়ের বন্ধন থাকে সবচেয়ে গভীর। দুধের সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা থাকে.বর্ণনাতীত। মায়ের চোখের সামনেই দুধের শিশুটিকে ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দিল ফিরাউন। মা তাকিয়ে আছে। তার চোখের সামনে তার সন্তান ফুটন্ত তেলে ভূনা হচ্ছে।

এ পৃথিবীতে মায়ের মমতার কোন তুলনা হয় না। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দার প্রতি তাঁর ভালবাসাকে মায়ের ভালবাসার সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন,আমি আমার বান্দাকে তার মায়ের চাইতেও বেশি ভালবাসি। বাবার ভালবাসার সাথে তুলনা দেননি। কারণ, মা সন্তানকে বাবার চাইতে অনেক বেশি ভালবাসে। এ মমতাময়ী মায়ের চোখের সামনেই তার দুই সন্তানকে ফুটন্ত তেলে যখন ভূনা করা হল তখন আল্লাহ্‌

তাআলা মায়ের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্যের পর্দা তুলে দিলেন। মা দেখল, তার সন্তানের আত্মা শরীর থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছে। বলে যাচ্ছে, মা , ধৈর্য ধর! তোমার জন্য পুরস্কার অপেক্ষা করছে। আমাদের সামনে জান্নাত প্রস্তুত। আমরা শীঘ্রই জান্নাতে গিয়ে মিলিত হব।

মা-কন্যা তিনজন এক সাথে জীবন বিলিয়ে দিল আল্লাহ্‌র নামে। তাদের পোড়া হাড়াগুলো পুতে রাখা হল মাটিতে।

এর দুই হাজার বছর পর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাচ্ছেন মি'রাজে। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে যখন তিনি আকাশের দিকে যাত্রা করেন তখন মাটির নিচ থেকে জান্নাতের খুশবু এসে তাঁকে আমোদিত করে তুলে। সেখান থেকে কাছেই মিশর। জান্নাতের খুশবু এসে নাসিকাগ্র স্পর্শ করতেই বললেন, জিবরাইল! জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি। কোথা থেকে আসছে এ সুঘ্রাণ! হযরত জিবরাইল (আ.) বলেন, দুই হাজার বছর আগে ফিরাউনের এক ঈমানদার দাসী তাঁর দুই কন্যাসহ আল্লাহ্‌র নামে জীবন উৎসর্গ করেছিল তাদের হাড় থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এ সুবাস।

কিশোর জিলানীর সত্যবাদিতা

সেকালে মানুষ দল বেধে বিশাল কাফেলা করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে যেত। এমনি এক কাফেলায় ইলম শেখার জন্য রওনা হয়েছেন আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। পথে তাঁদের কাফেলায় ডাকাত দল হামলা করল। কাফেলার সকল সম্পদ তারা লুটে নিল। হযরত জিলানী (রহ.) যেহেতু ছোট ছিলেন তাই ডাকাতরা কল্পনাও করেনি তার কাছেও টাকা-পয়সা কিছু থাকবে। তাই এমনিতেই এক ডাকাত তাঁকে জিজ্ঞেস করল, বাপু তোমার কাছে কিছু আছে কি? হযরত জিলানী (রহ.) বললেন, হ্যাঁ আছে। জিজ্ঞেস করল, কি আছে? বললেন, চল্লিশটি দিনার আছে। সে কালে চল্লিশ দিনারের অর্থ হল পুরো এক বছরের খরচ। মোটেও তুচ্ছ পরিমাণ নয়। এ কথা শোনে ডাকাত বিস্ময়ে বিমূঢ়। জিজ্ঞেস করল, কোথায় রেখেছ দিনারগুলো? বললেন, এ আমার জামার আস্তিনে সেলাই করে রাখা হয়েছে। ডাকাত বলল, বাপু তুমি যদি আমাকে এ দিনারের কথা না বলতে তাহলে আমি কোনভাবেই জানতে পারতাম না তোমার কাছে দিনার আছে। হযরত জিলানী (রহ.) বললেন, আমার মা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন- বাবা সর্বদা সত্য কথাই বলবে। এতে যদি জীবন চলে যায় তবুও মিথ্যা বলবে না। এ হচ্ছে মায়ের শিক্ষা। এখন যদি মা-ই না জানে যে সত্য বলা মুক্তির পথ তাহলে সন্তানকে কে শেখাবে?

ডাকাত হযরত জিলানী (রহ.) কে ধরে সরদারে কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, শুনুন সরদার! এ ছেলে কি বলে! হযরত জিলানী (রহ.) সব বলে দিলেন। সরদার বলল, বাপু! তোমার কাছে যে দিনার আছে এটা না বললেও পারতে। তুমি না বললে কিন্তু আমরা জানতে পারতাম না, তোমার কাছে দিনার রয়েছে। হযরত জিলানী (রহ.) বললেন, এটা আমার মায়ের উপদেশ। মা বলেছেন, যদি জীবন চলেও যায় তবুও মিথ্যা বলবে না। এ কথা শোনে ডাকাত দলের সরদার এমনভাবে কাঁদতে শুরু করে এতে তার চোখের পানিতে মুখের দাড়ি ভিজে যায় এবং সে বলে, হে আল্লাহ্! এ নিষ্পাপ বালক তার মায়ের এতটা অনুগত! আর আমি একজন পরিপূর্ণ যুবক হওয়া সত্বেও তোমার অবাধ্য। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। এরপর ডাকাত দলের সকলেই আল্লাহ্ তাআলার দরবারে তাওবা করে পাপের পথ থেকে ফিরে সুপথের দিকে ধাবিত হয়।

যেমন মা তেমন ছেলে

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-কে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বাহিনী পবিত্র মক্কা শরীফে তাঁকে ঘেরাও করলে অবশেষে তাঁর চারজন সঙ্গী ব্যতীত অবশিষ্ট সকলেই ছেড়ে চলে যায়। তাঁর মা ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)–এর কন্যা হযরত আসমা (রা.)। তিনি মায়ের কাছে গিয়ে বলেন, মা! শত্রুপক্ষ সন্ধির প্রস্তাব দিচ্ছে। বলছে, সন্ধি কর। তাহলে জীবনে বেঁচে যাবে। উত্তরে হযরত আসমা (রা.) যে শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সে শব্দ এতই কঠিন যা আমি উচ্চারণ করার সাহস পাচ্ছি না। হযরত আসমা (রা.) মা ছিলেন। তাই এমন কঠিন কথা বলার অধিকার তাঁর ছিল। আমি যদি খুব সহজ শব্দে বলি তাহলে এভাবে বলতে হবে– তিনি বলেছিলেন, তুমি যদি দুনিয়ার জন্য লড়াই করে থাক তাহলে তোমার এ লড়াই আমার জন্য চরম আক্ষেপের বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যদি পরকালের জন্য লড়াই করে থাক তাহলে তোমার বেঁচে থাকা আর জীবন দেয়া উভয়টাই আমার জন্য সমান। প্রাণ রক্ষার জন্য অন্যায়ের সামনে মাথা নত করার সুযোগ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন, মা! আমিও এ কথাই ভেবেছিলাম। তুমি আমাকে এ পরামর্শই দিবে।

إِنَّ فِى الْمَوْتِ رَاحَةً.

এ কথা বলেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ওঠে দাঁড়ান এবং বলেন, মা! জীবনে শেষবারের মত আলিঙ্গন কর।

হযরত আসমা (রা.) যখন পুত্রকে জীবনের শেষবারের মত জড়িয়ে ধরেন তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) –এর শরীরে লৌহবর্ম অনুভব করেন। জামার নিচে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) লৌহবর্ম পরিধান করে রেখেছিলেন।

: এ কি পরিধান করেছ আবদুল্লাহ?

লৌহবর্ম মা।

কেন?

: আমি যদি শাহাদাত বরণ করি, আমার ভয় হয় শত্রুপক্ষ আমার লাশ টুকরা টুকরা করে ফেলবে।

এ কথা শুনে হযরত আসমা (রা.) যে জবাব দিয়েছিলেন আজও তা আরবী সাহিত্যের বিরাট বড় সম্পদে পরিণত হয়ে রয়েছে। তিনি বলেছিলেন–

اَلشَّاةُ الذَّبُوحَةُ الْعَجُوْلُ الْمَصْلَةَ.

বেটা! বকরি যখন জবাই হয়ে যায় তখন তার চামড়া তুলে নেয়ার দ্বারা তার কোন কষ্ট হয় না।

যাঁরা আল্লাহ্র পথে জীবন দেয়– বেটা! তারা কিন্তু লোহার সাহায্য গ্রহণ করে না। তুমি আমার সামনে লৌহবর্ম খুলে ফেল।

আমাদের একালে মায়েরা যেমন তাদের সন্তানদেরকে বিয়ের বর সাজিয়ে দেয় সেকালে মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে শহীদের সাজে সাজিয়ে দিত। আল্লাহ্র নামে জীবন দানের জন্য আল্লাহ্র পথে পাঠিয়ে দিত। একদিকে চার জন আল্লাহ্র পথের সৈনিক। বিপরীত দিকে তিন হাজার হাজ্জাজের সৈন্য। সকাল থেকে নিয়ে আসর পর্যন্ত লড়াই চলতে থাকে। কিন্তু কেউ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) –এর কাছেও ঘেষতে পারে নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) দুই হাতে তরবারী চালনায় ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ। তাই তাঁর কাছে আসা মানে নিজেই নিজের মরণকে ডেকে আনা। আসরের পর শত্রপক্ষ আবু কুবাইস পর্বতে ওঠে সেখান থেকে তোপের মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করে। সে আবু কুবাইস পর্বত এখন সউদী বাদশাহদের প্রসাদ। পাথর এসে হযরত আবদুল্লাহ

ইবনে যুবায়ের (রা.) এর মাথায় আঘাত হানে। ভারী পাথর। সাথে সাথেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর মাথার রক্তে হাত রঞ্জিত করে এ কবিতা আবৃত্তি করেন–

وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُوْمُنَا لٰكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ
تَقْطُرُ دِمَاءُ -

কোমরের রক্তে গোড়ালি রঞ্জিত করার লোক আমি নই। আমি তো আমার বুকের রক্তে হাত সজ্জিত করি মেহেদির রঙে।

পরপর দুটি পাথর এসে মাথায় আঘাত হানে। এতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) পড়ে যান মাটিতে। তখন তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছর। সত্তর বছর বয়সে মাত্র চারজন আল্লাহ্‌র সৈনিক লড়ে যাচ্ছেন তিন হাজার হাজ্জাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে। তিনি যখন মাটিতে পড়ে যান তখন সর্বশেষ তাঁর মুখ থেকে এ শব্দগুলো উচ্চারিত হয়–

أَسْمَاءُ إِنْ قُتِلْتُ لَا تَبْكِيْنِيْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا حَسَبِيْ وَدِيْنِيْ -

আসমা! আমি যদি শহীদ হই কান্না করবে না। আমার দ্বীন ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় নি।

শাহাদাতের পর তাঁর লাশ হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ 'হাজুন' নামক স্থানে শুলিতে ঝুলিয়ে দেয়। সেখানে তাঁর লাশ এক সপ্তাহ পর্যন্ত জ্বলতে থাকে।

তৃতীয় দিন সে পথে যাচ্ছিলেন হযরত আসমা (রা.)। তিনি শুলিতে ঝুলন্ত পুত্রের লাশের দিকে তাকিয়ে বলেন–

'তোমার কি এখনও নামবার সময় হয়নি?'

আমাদের আজকালের মহিলারা এটাও বুঝে না যে, সন্তানকে কিভাবে গড়ে তুলতে হয়। সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার অর্থই বা কি। আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি নামাযী হয়ে যায় তাহলে আমরা মনে করি, তারা বুঝি গড়ে ওঠেছে। অথচ মানব জীবনে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন সর্বাধিক মনোযোগ নিবিষ্ট করা। এসব বিষয় মায়েরা কিন্তু আজাকাল বুঝেই না আর বাবাদের এসব বিষয়ে নজর দেয়ার সময়ই হয় না।

একেই বলে মুসলিম নারী

শামসুর রহমান নামে আমাদের এক বন্ধু থাকেন জার্মানীতে। তাঁর স্ত্রী একজন নওমুসলিম। তাঁর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এরপর তাঁকেই বিয়ে করেছেন। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে এতই সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন

যা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর সন্তানের বয়স মাত্র চার বছর। অথচ তাঁদের ঘরে যদি কোন মহিলা আসে তাহলে সে 'মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষ' বলে দৌড়ে কামরার ভেতর চলে যায়। এতটুটু বয়সেই সে শিখে গেছে পর্দা করতে হবে। তাদের ঘরে বাচ্চারা যদি দুষ্টুমি করে তখন তাদের মা বাচ্চাদেরকে এ বলে শাসায়–দেখ, যদি বেশি দুষ্টুমি কর তাহলে কিন্তু আমি তোমাদেরকে স্কুলে ভর্তি করে দেব এবং ডাক্তার বানাব। তখন বাচ্চারা এ বলে কান্না করতে থাকে, না না! আমরা ডাক্তার হব না। আমরা আলেম হব মা তার সন্তানদেরকে এ বলে ভয় দেখায়, যদি আমার কথা না শোন তাহলে আমি তোমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার বানাব। তখন সন্তানেরা এ বলে মায়ের কাছে আকুতি জানায়, আর দুষ্টুমি করব না, তবু আমাদেরকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ো না। একেই বলে মুসলিম নারী। মুসলিম নারীরা তাদের আত্মার ধন সন্তানদেরকে এভাবেই গড়ে তুলে। কুরআনে কারীমে এ পথকেই বলা হয়েছে–

إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ -

এটাই তো সুদৃঢ় সংকল্পের কাজ। (লুকমান:১৭)

সত্যিকার পিতার বৈশিষ্ট্য

আমাদের আরেক বন্ধুর কথা শুনুন। নাম মাওলানা বেলাল। আমরা রাইভেণ্ডে একই সাথে লেখাপড়া করেছি। তার বাবা বাংলাদেশে থাকতেন। মূলত তারা ভারতের উত্তর প্রদেশের লোক। ১৯৫৫ কি ৬০ সালের কথা। তখন বাংলাদেশে তাদের টেক্সটাইল মিল ছিল। সে আমাকে বলেছে, একবার আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা হারিয়ে গেল। সে ১৯৬৪ সালের কথা। আমি ভেতরে ভেতরে খুবই ভয় পাচ্ছিলাম। কারণ, টাকাটা হারিয়েছে আমার দোষেই। ভাবছিলাম, কখন আব্বা জিজ্ঞেস করে বসেন। এজন্য নির্ঘাত আমাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! আব্বা আমাকে একবারও টাকার কথা জিজ্ঞেস করেননি।

প্রতিদিন আমাদের মসজিদে ইশার পর তালিম হত। একদিন আমি মসজিদে তালিমে না বসে ঘরে চলে এসেছি। আব্বা তখন ঘরে ফিরেই আমাকে খুব কঠিন ভাবে শাসালেন। বললেন, কি হয়েছে তোমার? তালিমে বসনি কেন? আমার বন্ধু বলেছিলেন, সেদিন আমি বুঝতে পেরেছি আমার আব্বার কাছে বিশ হাজার টাকার চাইতে একটি তালিমের মজলিস অনেক বেশি দামী। আমি বিশ হাজার টাকা হারিয়েছি। এর জন্য তিনি আমাকে

একটি শব্দ বলেননি। কিন্তু একদিন তালিমে বসিনি বলে তিনি আমাকে কঠোর ভাষায় শাসন করেছেন। এ হল সত্যিকার পিতার বৈশিষ্ট্যের রূপ। সত্যিকার বাবার তিনি-ই, যিনি তার সন্তানের ভবিষ্যত দেখেন এবং সন্তানের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সর্বদা সতর্ক থাকেন।

ছিল জেলে–বনে গেল বাদশাহ

এক ছিল জেলে তার নাম আবু শুজা। সে যখন মাছ ধরছিল তখন সাথে ছিল তার তিন পুত্র। তাদের পাশ দিয়ে ইরানের এক জ্যোতিষী যাচ্ছিল। আবু শুজা তাকে দেখে বলল, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি এর ব্যাখ্যা বলে দাও। জ্যোতিষী বলল, কি স্বপ্ন বল?

আবু শুজা বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম প্রস্রাব করছি। আমার প্রস্রাব থেকে একটি আগুন বেরিয়ে উপরে চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে একটি স্ফুলিঙ্গের রূপ ধারণ করল। সে স্ফুলিঙ্গ থেকে আরও তিনটি স্ফুলিঙ্গ বের হল। আবার সেগুলোর উপরও ছিল ছোট ছোট অনেক শিখা। জ্যোতিষী স্বপ্ন শোনার পর আবু শুজাকে বলল, একদিন তোমার এ তিন ছেলে বাদশাহ হবে।

একথা শোনার পর আবু শুজা খেপে গিয়ে সে পায়ের জুতা খুলে জ্যোতিষীকে ধাওয়া করে এবং ছেলেদেরকে বলে, ধর এ বদমাশকে, গরীব বলে সে আমাদেরকে ঠাট্টা করছে। সত্যি সত্যি চার বাপ -বেটা মিলে জ্যোতিষীকে খুব ধোলাই দিল। কিন্তু জ্যোতিষী তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে সে বলল, আমাকে যতই মার তোমরা একদিন বাদশাহ হবে। অনেক উত্তম-মধ্যমের পরও যখন জ্যোতিষীর একই বক্তব্য তখন আবু শুজা বলল ঠিক আছে। একে তো নির্যাতন কম করিনি, এবার কিছু মাছ দিয়ে দাও।

এ ঘটনার বিশ বছর পর এ তিন পুত্র সত্যি সত্যিই ইসলামী সাম্রাজ্যের বাদশাহ হয়েছিল। রূকনুদ্দৌলাহ, মুইজুদ্দৌলাহ, ইজ্জুদ্দৌলাহ। তাদের মধ্যে রুকনুদ্দৌলাহ ছিল অত্যন্ত সফল ও স্বার্থক শাসক। সুতরাং পিতামাতা কখনও সন্তানের ভাগ্য নির্মাণ করতে পারে না। তকদীরে যা আছে তাই হবে। মা-বাবা পারে সন্তানের চরিত্র নির্মাণ করতে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সন্তানদেরকে উত্তম আখলাকে গড়ে তোলা। বিশেষভাবে লুকমান হাকীম তাঁর সন্তানকে যে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন -ঈমান, আখিরাত, নামায, সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে বাঁধাদান, ধৈর্য ও উত্তম চরিত্র- এ বিষয়গুলোর উপর যত্ন করে সন্তানদেরকেও গড়ে তোলা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সীমাহীন মেহেরবাণী

হযরত ইউনুস (আ.)-কে মাছে খেয়ে ফেলেছিল। কিছুদিন মাছের পেটে থাকার পর মাছ তাঁকে উগলে ফেলল। তিনি যখন মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এলেন তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন, তোমার সম্প্রদায় তওবা করেছে। তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। যখন হযরত ইউনুস (আ.) স্বজাতির কাছে যাচ্ছেন তখন পথে লক্ষ্য করলেন, এক কুমার মাটির পাত্র তৈরি করছে। হাতে মাটির পাত্র বানিয়ে তা আগুনে পুড়িয়ে সাজিয়ে রাখছে। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইউনুস (আ.) কে বললেন- আচ্ছা, এ কুমারকে বল একটি পাত্র ভেঙ্গে ফেলতে। হযরত ইউনুস (আ.) কুমারকে বললেন, ভাই এ একটি পাত্র ভেঙ্গে ফেল?

কুমার বলল, কেন, কি হয়েছে? আমি নিজ হাতে এ পাত্র তৈরী করেছি। আবার ভাঙ্গব কেন?

হযরত ইউনুস (আ.) বললেন, হে আল্লাহ্! সে তো পাত্র ভাঙ্গতে রাজি নয়। আল্লাহ্ তাআলা বললেন- দেখ, এ কুমার সামান্য একটি পাত্র ভাঙ্গতে প্রস্তুত নয়। আর যে বান্দাদেরকে আমি আপন সৃষ্টি করেছি তুমি আমার হাতেই তাদেরকে মারতে বসেছিলে। এখন তুমি গিয়ে দেখ, তারা অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে আমার কাছে ফিরে এসেছে।

হযরত উসমান (রা.)-এর নামায

হযরত উসমান (রা.) মসজিদে আগমন করছেন। এক পাশে জুতা রেখে নামাযে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত শুরু করেছেন- আলিফ লাম মীম...। পাশেই উপবিষ্ট হযরত আবদুর রহমান তাইমী (রা.)। তিনি লক্ষ করলেন, হযরত উসমান (রা.) এসে নামাযে দাঁড়িয়েছেন। তিলাওয়াত শুরু করেছেন- আলিফ লাম মীম....। ভেতরে অনুসন্ধিৎসা জাগল- দেখি কোথায় গিয়ে সিজদা করেন! সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন বাকারা শেষ, আলে ইমরান শেষ করে নিসা, মায়িদা, আনআম আ'রাফ। আশ্চর্য দশ পারা শেষ। বিশ পারা শেষ। ত্রিশ পারা শেষ। সূরা নাস পড়ে হযরত উসমান (রা.) রুকুতে গেলেন। এ হল ইনফিরাদী আমলের নমুনা।

ন্যায়পরায়ন এক বাদশাহ

এক ব্যক্তি সুলতান মাহমুদ গজনবীকে বলল, আমার প্রতি যুলুম করা হচ্ছে। প্রশ্ন করলেন, কে তোমার প্রতি যুলুম করছে? বলল, আপনার

ভাগিনা। সে রাতের বেলা আমার ঘরে এসে আমার স্ত্রীর প্রতি যুলুম করে আর আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। এখানে আমাকে সাহায্য করার মত কেউ নেই।

সুলতান মাহমুদ গজনবী বললেন, আমার কাছে এত দিন আসনি কেন? এরপর তিনি পাহারাদারদের ডেকে বলে দিলেন, এ ব্যক্তি যখনই আসবে সাথে সাথে আমাকে সংবাদ দিবে।

তৃতীয় রাতে সে ব্যক্তি এসে উপস্থিত। তার চোখে পানি। সুলতান মাহমুদকে পূর্ব ঘটনা জানানো হল। তিনি অস্ত্র হাতে সাথে সাথে বেরিয়ে তার ঘরে চলে গেলেন। সে যুবক তখন ঘরেই ছিল। সুলতান মাহমুদ ঘরে প্রবেশ করে সাথে সাথে বাতি নিভিয়ে দিলেন। এরপর তরবারির এক আঘাতে শরীর থেকে মাথা আলাদা করে আবেদনকারী ব্যক্তিকে বললেন, আমাকে পানি দাও।

লোকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পানি নিয়ে এল।

সুলতান পানি পান করে বললেন, এবার বাতি জ্বালাও।

তখন সুলতান নিহত লাশটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ!

লোকটি বিস্ময়ের সাথে বলল, সুলতান! আপনি এসেই বাতি নিভিয়ে দিলেন এবং লোকটিকে হত্যা করার পর পানি চাইলেন। এরপর আলহামদুলিল্লাহ বললেন। বিষয়টি কিছুই বুঝলাম না।

সুলতান বললেন, যেদিন তুমি আমার কাছে ফরিয়াদ নিয়ে এসেছিলে, সেদিন আমি আল্লাহ্‌র কসম করেছিলাম। তোমার এ নালিশের কোন সুরাহা না করে আমি কিছুই খাব না, কিছু পান করব না। তাই তিন দিন যাবত আমি অনাহারে, তৃষ্ণার্ত আছি।

এটাই ছিল আমাদের অতীত। এখন তো এগুলো কেবলই ইতিহাসের গল্প। আমরা এখন কেবল এসব গল্পই বলতে পারি। আজ আমরা যেমন আমাদের শাসকও তেমন। হয়তো আমরা ছোট জালেম আর তারা বড় জালেম।

তোমার ঘরে এসেই বাতি নিভিয়ে দিয়েছি। কারণ সে আমার বোনের সন্তান। এর সাথে আমার আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। এর চেহারা দেখলে হয়তো ঠিকমত তরবারি চালাতে পারব না। অপরাধীকে হত্যা করার পর আলহামদুলিল্লাহ বলেছি এর কারণ, দেখলাম সে আমার খান্দানের কেউ

নয়। আমার বোনের ছেলে হওয়া তো দূরের কথা, আমার বংশের সাথেও এর কোন সম্পর্ক নেই। সে আমার নামে প্রতারণা করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে, জুলুম করেছে।

বর্তমান সময়ে এমন শাসক ও এমন বিচার ব্যবস্থার কথা কি আমরা চিন্তা করতে পারি।

কোথায় গেলো এমন ক্রেতা ও বিক্রেতা?

একটি ঘোড়া কিনেছেন হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)। এ ঘোড়া কিনতে পাঠিয়েছিলেন একজন চাকরকে। চাকর মালিকসহ ঘোড়া নিয়ে এসেছে তিনশত দিরহাম দেয়ার শর্তে। হযরত জারির (রা.) লক্ষ করলেন, ঘোড়াটি খুবই দামী। মালিক এর যথাযথ মূল্য সম্পর্কে হয়ত অবগত নয়। তাই তিনি ঘোড়ার মালিককে বললেন, তিনশত নয়; আমি তোমাকে ঘোড়ার মূল্য দিচ্ছি চারশত দিরহাম।

মালিক বলল, জি! খুবই ভাল কথা।

জারির (রা.) বললেন, যদি পাঁচশত দিই?

ঃ জ্বী, আরও ভাল!

ঃ যদি ছয়শত দিই?

ঃ যদি সাতশত দিই?

ঃ এবার বিক্রেতা কিছুটা বিব্রত হল। ক্রেতা কেন মূল্য বাড়িয়ে দেয়। এমন কথা কখনো শুনিনি!

এই যে দোকানদারগণ বসে আছে, এদের চরিত্র কি? যারা ক্রেতা তারা চেষ্টা করে দাম কমাবার। আর এখানে হচ্ছে বিপরীত। ক্রেতা ক্রমাগত দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে। বিক্রেতা বিস্ময়ের সাথে তার কথা শোনে যাচ্ছে। জারির বললেন, আচ্ছা! আটশত দিরহাম দিব?

বিক্রেতা বলল, আমি তিনশত দিরহাম দিতে রাজি ছিলাম। আটশত দেবেন, ঠিক আছে। দিন আর ঘোড়া রাখুন।

ঘোড়া রেখে মূল্য নিয়ে চলে গেল ঘোড়ার মালিক।

গোলাম বলল, আমি কিন্তু তিনশত দিরহাম দিয়ে ঘোড়া কিনে ছিলাম। আপনি অতিরিক্ত পাঁচশত দিরহাম কেন দিতে গেলেন?

হযরত জারির (রা.) বললেন–দেখ, ঘোড়াটির উচিত দাম ছিল আটশত দিরহাম। আমি যদি তিনশত দিরহাম দিয়ে রেখে দিতাম তাহলে

আল্লাহ্‌র তাআলার কাছে কি জবাব দিতাম? আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অংগীকার করেছি, যতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকব ততদিন প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ করার চেষ্টা করব। একেই বলে আদর্শ মানুষ আর সুচিন্তিত চিন্তা-ভাবনা।

এখন ব্যবসা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেক স্থানেই। কিন্তু এমন ব্যবসায়ী ক'জন আছে যে তার ক্রেতার কল্যাণের কথা ভাবে? অথচ ক্রেতার কল্যাণের কথা ভেবে যারা ব্যবসা করে তাদের হাশর হবে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাথে।

ছিল জাহান্নামী হয়ে গেল জান্নাতী

আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে দুই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে এনে বলবেন পুনরায় জাহান্নামে চলে যাও। একজন দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দ্বিতীয়জন যেতে যেতে বারবার পিছনের দিকে ফিরে তাকাবে। আল্লাহ্ তাআলা যে জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাকে ডেকে আনবেন। আর যে বারবার পিছনের দিকে তাকাচ্ছিল তাকেও ডাকবেন। বলবেন, তুমি কেন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লে? সে বলবে, হে আল্লাহ্! সারা জীবন তোমার নাফরমানী করেছি, যে কারণে আজ আমি আগুনের মুখোমুখি। ভেবেছি, অন্তত একবার তোমার হুকুম পালন করে দেখি, হয়তো এর উসিলায় উদ্ধার পেয়েও যেতে পারি। দ্বিতীয়জনকে বলবেন, তুমি কেন বারবার পিছনের দিকে দেখছিলে? আরয করবে, হে আল্লাহ্! তুমি একবার আমাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসেছ। তোমার দান ও দয়ার কথা আসমান জমিনে সকলেই জানে। আমি বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম কখন তোমার দান আমার দিকে নিবিষ্ট হয়। আর আমি কখন নাজাতের ফয়সালা পাব। আল্লাহ্ তাআলা তখন উভয়কে লক্ষ করে বলবেন– যাও, আমার ফয়সালা হয়ে গেছে। এবার তোমরা জান্নাতে চলে যাও।

আল্লাহ্‌র বিধান এমনই! তাঁর চাইতে বড় মেহেরবান, বড় দানশীল কেউ নেই, হতে পারে না। অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহ্ই আমাদেরকে ডাকছেন, তোমরা আমার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন কর।

যার কারণে বৃষ্টি বন্ধ, তাঁর কারণেই বৃষ্টি চালু

একবার বনী ইসরাইল অনাবৃষ্টির কারণে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের শিকার হল। তারা সদলে এসে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আরয করল– হে মূসা! দু'আ করে দিন, আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে এ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ

থেকে মুক্তি দান করেন। হযরত মূসা (আ.) সত্তর হাজার সঙ্গী নিয়ে বের হয়ে নামায পড়লেন। আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্ ! বৃষ্টি দাও। কিন্তু সূর্যের তাপ বেড়েই চলেছে। আরয করলেন, হে আল্লাহ্! আমরা বৃষ্টি কামনা করছি, আর তুমি সূর্যের তাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছ!

আল্লাহ্ তাআলা বললেন–

اِنَّ فِيْمَ رَجُلاً يُبَارِزُنِى بِالْمَعَاصِىْ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ عَامًا .

তোমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে চল্লিশ বছর ধরে আমার সাথে পাপের লড়াই করছে।

সে বিগত চল্লিশ বছরে আমাকে একবারও ডাকেনি। চল্লিশ বছর ধরে সে আমাকে উত্তেজিত করছে। এজন্য আমি বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছি। তাকে বল বাইরে এসে দাঁড়াতে। এরপর আমি বৃষ্টি দেব।

হযরত মূসা (আ.) ডাকলেন–

يَا مَنْ عَصَى اللّٰهَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً .

চল্লিশ বছর ধরে কে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করছ, বেরিয়ে এসো।

পাপী টের পেয়ে গেছে। সে এদিক ওদিক দেখছে। দেখছে কেউ বের হচ্ছে না। অবশেষে মনে মনে বলতে লাগল–

لَوْ خَرَجْتُ فَضَحْتُ نَفْسِىْ .

যদি বের হই তাহলে চরম লজ্জিত হব।

বেরিয়ে আসা মানেই নিজেকে অপমানিত করা। আর যদি বেরিয়ে না আসি তাহলে বৃষ্টি হবে না। ফলে সবাইকে কষ্ট করতে হবে। এ কথা ভেবে সে গায়ের চাদরে নিজের মুখ আবৃত করে ফেলল। মাথা ঢেকে ফেলল। যেন চোখের পানি কেউ দেখতে না পায়। এরপর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করল–

اَرْبَعِيْنَ سَنَةً! مَهَّلْتَنِىْ فَجِئْتُكَ تَائِبًا فَاقْبَلْنِىْ .

হে আল্লাহ্ ! আমি চল্লিশ বছর তোমার নাফরমানী করেছি। তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে সুযোগ দিয়েছ। কারও সামনে আমার পাপ প্রকাশ করনি। আজ আমি তোমার কাছে তাওবা করছি, তুমি আমার তাওবাকে কবুল কর।

এখনও তার দু'আ পূর্ণ হয়নি। আকাশ ছেয়ে গেল কাল মেঘে। শুরু হল প্রবল বর্ষণ। আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন– মূসা! যার কারণে বৃষ্টি বন্ধ রেখেছিলাম, তার কারণেই বৃষ্টি দান করলাম।

আমাদের আল্লাহ্র মহিমা এমনই! তিনি আসমান ও জমিনের বাদশাহ। দয়া ও অনুগ্রহ তাঁর সীমাহীন। চল্লিশ বছরের পাপ ক্ষমা করে দিলেন দু'ফোটা অশ্রুর বিনিময়ে।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন– হে আল্লাহ্! বল লোকটা কে?

ইরশাদ করলেন– যখন সে নাফরমান ছিল তখন তার নাম প্রকাশ করিনি। আর তাওবা করার পর তার নাম প্রকাশ করে লজ্জিত করব!

এক নারীর কান্না আরশের দরজা খুলে দিয়েছে

হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা (রা.)কে তার স্বামী তালাক দিলেন। যিহার তালাক। জাহেলি যুগের প্রচলিত তালাক। নিজের স্ত্রীকে 'তুমি আমার মায়ের মত' এ জাতীয় কথার দ্বারা তৎকালে তালাক দেয়ার প্রচলন ছিল। একবার এ ধরণের তালাক দিলে তাকে আর ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা ছিল না। স্বামীর মুখে একথা শুনতেই হযরত খাওলা (রা.) ছুটে এলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর দরবারে। আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্বামী আমাকে যিহার তালাক দিয়েছে। আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।

এটা ছিল জাহেলি যুগের তালাক। শরীয়তে তখনও এ সম্পর্কিত কোন বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি তাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন রেওয়াজ মাফিক বলে দিলেন– তালাক হয়ে গেছে।

হযরত খাওলা (রা.) আরয করলেন, তাহলে আমি এখন কোথায় যাব?

সন্তান প্রসব করতে গিয়ে আমার পেট দীর্ণ হয়ে গেছে।

আমার বয়সও এখন অনেক।

মা–বাবা মরে গেছেন।

যৌবন হারিয়ে গেছে। আমার ধন–সম্পদও ফুরিয়ে গেছে।

এখন আমি কোথায় যাব?

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন, তালাক হয়ে গেছে।

হযরত খাওলা (রা.) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ বিধান রহিত করে দিন।

তার অনুরোধে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কথা বলতে পারলেন না। মাথা নত করে বসে রইলেন।

এবার হযরত খাওলা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি আমার কথা না রাখেন তাহলে আমি নিজেই আমার আল্লাহ্কে আমার কথা বলব। এরপর তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে অশ্রুসজল চোখে আবেদন করলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لِىْ صِبْيَانًا صَغَ+ارًا ....

হে আল্লাহ ! তুমি জান আমার ছোট ছোট কয়েকজন
সন্তান রয়েছে। যদি আমি তাদেরকে আমার কাছে রাখি
তাহলে তারা ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। আর যদি আমার স্বামীর
কাছে ছেড়ে দেই তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হে আল্লাহ্! তুমি আমার পক্ষে ফায়সালা দাও।

হযরত খাওলা (রা.) এ কথা বলেননি, তোমার যা খুশি ফায়সালা কর। বলেছেন, তুমি আমার পক্ষে ফয়সালা দাও।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত খাওলা (রা.)-এর এ দু'আর প্রেক্ষিতে সাধারণ ফয়সালা পাঠাননি বরং কুরআন বিধান সম্বলিত পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত এ উম্মত এবং কুরআন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তারা হযরত খাওলা (রা.)-এর এ কাহিনী শুনতে থাকবে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা প্রকাশিত হতে থাকবে।

হযরত খাওলা (রা.) আবেদনরত। এখনও তিনি হাত নামাননি। তার কান্না আরশের দরজা খুলে দিয়েছে। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে জানিয়েছেন, একজন নারীর দরদভরা কান্না আল্লাহ্র আরশকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে ওহী অবতরণের নিদর্শন ছাপিয়ে উঠেছে। হযরত আয়েশা (রা.) হযরত খাওলাকে বললেন, হাত নামাও। ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর ঘামে সিক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি শরীরের ঘাম মুছলেন। বললেন, খাওলা! তোমাকে মুবারকবাদ! আল্লাহ্ তায়ালা তোমার পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন।

قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا ـ

আল্লাহ্ অবশ্যই সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর
বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে। (সূরা মুজাদালা : ১)

وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللهِ ـ

এবং আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদও করেছে।

وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ـ

আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শুনেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাক মেনে নিচ্ছিলেন। হযরত খাওলা (রা.) অস্বীকার করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তাআলা এ কাহিনী দেখছিলেন, শুনছিলেন। এরপর চূড়ান্ত ঘোষণা করে দিলেন–

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَاهُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ـ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰئِىْ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَ زُوْرًا وَاِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ـ

তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সাথে যিহার করে
তারা জেনে রাখুক–তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নন; যারা
তাদেরকে জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মাতা।
তারা কিন্তু অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্
পাপমোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (সূরা মুজাদালা : ২)

আল্লাহ্র সাথে যার মহব্বত সে-ই সফল কাম

হযরত হুসাইন বাগদাদী (রহ.) বাজারে গিয়ে দেখলেন, একজন দাসী বিক্রি হচ্ছে। ভয়ানক কাল। বিক্রেতা বলল এর মাথায় কিছুটা গণ্ডগোল আছে। ইচ্ছা করলে নিতে পার। তিনি বলেন, দাসীটির চেহারা দেখে আমার কাছে পাগল বলে মনে হল না। আমি তাকে কিনে নিলাম।

তখন রাত দুপুর। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম, দাসীটি মুসল্লায় বসে আছে। চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছে। আল্লাহ্র সাথে একান্তে কথাবার্তা হচ্ছে। আমি নিমগ্ন ধ্যানে তার কথা শুনছিলাম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ

করলাম, সে বলছে– হে আল্লাহ্! তুমি যে আমাকে ভালবাস আমি সে ভালবাসার দোহাই দিচ্ছি। একথা বলতেই হুসাইন বাগদাদী (রহ.) তার কথায় বাঁধা দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দী! তুমি কি বলছ? বল, হে আল্লাহ্! আমি যে তোমাকে ভালবাসি সে ভালবাসার দোহাই।

দাসী সাথে সাথে বলল, হুসাইন!চুপ কর। তিনিই যদি আমাকে ভাল না বাসতেন তাহলে আমাকে এ মুসল্লায় এনে দাঁড় করাতেন না। আর তোমাকেও এখানে শুইয়ে রাখতেন না। আমাকে ভালবাসেন বলেই মুসল্লায় এনে দাড় করিয়ে দিয়েছেন। যদি তোমাকে ভালবাসতেন তাহলে তোমাকেও মুসল্লায় এনে দাঁড় করিয়ে দিতেন। এরপর সে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, হে আল্লাহ্! এতদিন পর্যন্ত আমার রহস্য পর্দাবৃত ছিল। তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কথা কেউ জানত না। এখন কিন্তু মানুষ জেনে ফেলেছে। এখন তুমি আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও। একথা বলে সজোরে চিৎকার দিল এবং এতেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

মুহাম্মদ হুসাইন বাগদাদী (রহ.) বলেন, আমি সম্পূর্ণ ঘাবড়ে গেলাম। খুব ভোরে কাফনের কাপড় কেনার জন্য বাজারে গেলাম। কাফন নিয়ে এসে দেখলাম, সবুজ রঙের রেশমি কাফনে তার শরীর আবৃত। আর তার উপরে লেখা আছে–

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

শোন, আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা
দুঃখিতও হবে না। (সূরা ইউনুস : ৬২)

রাজত্ব উনিশ বছরের আফসোস অনন্তকালের

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান লাখ লাখ মানুষকে কতল করেছিল নিজ সিংহাসনকে শক্তিশালী করার জন্য। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের গভর্নর হাজ্জাজ হত্যা করেছিল সোয়া লাখ মানুষ। এখানে আবদুল মালিক নিজ হাতে যেসব মানুষকে হত্যা করেছে এর হিসাব আলাদা। যুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের হিসেবও এর বাইরে। সে মোট রাজত্ব করেছিল উনিশ বছর। কিন্তু যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল তখন সে যে কাণ্ড করেছিল তা সত্যিই ভাবনার মত। বাইরে একজন ধোপা কাপড় আছড়াচ্ছিল। খলীফার রাজমহলের দরজা জানালা সবই খোলা ছিল। ধোপা যখন সজোরে পাথরে কাপড় আছড়াচ্ছিল তখন তার

প্রকটধ্বনি রাজমহলের ভিতরে গিয়ে আঘাত হানছিল। আওয়াজ শোনে আবদুল মালিক জিজ্ঞেস করল, এটা কিসের আওয়াজ? দাস-দাসীরা বলল, ধোপা কাপড় ধুচ্ছে। এটা কাপড় ধোয়ার আওয়াজ। আবদুল মালিক একটি শীতল নিঃশ্বাস ছাড়ল। এরপর হতাশার সুরে বলল, আহা! আমি যদি একজন গরীব কুরাইশী হতাম! আমি যদি একজন অসহায় কুরাইশী হতাম আর লোকদের উট চড়াতাম! বিনিময়ে যে সামান্য পারিশ্রমিক পেতাম তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতাম। আহা! আমি যদি এ প্রশাসন ও রাজ কুরসির স্বাদ কখনও আস্বাদন না করতাম! কিন্তু এখন আফসোস করেই কি লাভ! তীর কামান থেকে বেরিয়ে গেছে। সময় আসলেই এমন একটি দ্রুতগামী তীর-কামান যা থেকে বেরিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু সময় যদি একবার হাত থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে আকাশও পৃথিবী উল্টো দৌড়েও তা ফিরিয়ে আনা যায় না।

পিতা মাতার নাফরমানীর পরিণতি

এক সাহাবীর মৃত্যু সন্নিকটবর্তী। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কালেমা বের হচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানানো হল। নবী-রাসূলগণের পরই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সাহাবী। তাদের মত আর কেউ এ দুনিয়াতে কখনও আসবে না। সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। সাহাবীর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই ধরে ফেললেন, এ কোন পাপের অভিশাপ। কোন পাপ তার মুখকে বন্ধ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে তার মাকে ডেকে পাঠালেন। তার মা আসলে বললেন- তুমি তোমার ছেলেকে ক্ষমা করে দাও। মা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তাকে ক্ষমা করব না। কারণ সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আমি একে আগুনে পোড়াব। মা বললেন, এটা আমি বরদাশত করতে পারব না। বললেন, তুমি যদি তাকে ক্ষমা না কর তাহলে সে সোজা জাহান্নামে যাবে। মা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। মায়ের মুখ থেকে এ কথা বের হবার সাথে সাথেই দেখা গেল, ছেলের মুখে কালেমা জারি হয়ে গেছে এবং সাথে সাথেই সাহাবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযা পড়ালেন।

অন্যায় থেকে বাঁচার কেমন আগ্রহই ছিলো

মালিক মাহমুদ মুজাফফর গুজরাটের অত্যন্ত প্রভাবশালী বাদশাহ ছিলেন। তিনি তার দরবারে একজন ব্যক্তিকে কেবল এ দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছিলেন, তার হাতে সর্বদা কাফনের কাপড় রাখা থাকত। সে কাফনের কাপড়ে মাখানো থাকত কর্পূর। বাদশাহ তাকে বলে রেখেছিলেন, তোমার কর্তব্য হল যখনই দেখবে আমি কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত দিচ্ছি তখনই সাথে সাথে দাঁড়িয়ে এ কাফনের কাপড় উড়িয়ে দিবে।

যখনই তিনি কোন অন্যায় ফয়সালা করতেন তখন লোকটি দাঁড়িয়ে কাফনের কাপড় উড়াতে থাকত। কাফনের কাপড় উড়াবার সাথে সাথে মালিক মাহমুদ বেহুশ হয়ে নিচে পড়ে যেতেন। এরপর যখন হুশ ফিরে আসত তখন তার পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতেন।

একেই বলা যায় আখিরাত অনুভূতির ভাবনা। তাঁর মা হয়তো তার অন্তরে এ অনুভূতি যত্নের সাথে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে বাদশাহ হওয়ার পরও তার অন্তরে এ অনুভূতি ছিল জীবন্ত। বাদশাহীর ভেতর দিয়েও তিনি জান্নাতী মর্যাদা অর্জন করেছেন। অথচ আজ আমাদের সমাজের একজন নিম্নস্তরের কর্মচারীও যুলুম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়।

এটা বাদশাহী নয়, নবুওয়ত

মক্কা বিজয়ের সময় যখন হযরত আবু সুফিয়ানকে ধরে আনা হল এবং হযরত আব্বাস (রা.) তাকে নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে গেলেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাকে তোমার তাবুতে রাখ। যখন ফযর নামাযের আযান হল তখন সাহাবায়ে কিরাম ছুটতে লাগলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, এ কি! আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, না, এরা নামাযে যাচ্ছে। আবু সুফিয়ান (রা.) বললেন, হ্যাঁ, এরা আমার ভাতিজার প্রতিটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে মানে। তিনি যদি বলেন, জীবন দিয়ে দাও, তাহলে এরা জীবন দিয়ে দিবে। আবু সুফিয়ান বললেন, আব্বাস ! আমি অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহর দরবারে গিয়েছি, কিন্তু তোমার ভাতিজার মত বাদশাহ এবং বাদশাহী আর কোথাও দেখিনি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আবু সুফিয়ান! এটা বাদশাহী নয়, নবুওয়ত। কোন বাদশাহকে তার প্রজারা এভাবে মান্য করে না।

মৃত্যুর মুখোমুখি–এরপরও নামায ছাড়েন নি

উঠ নামায পড়। অথচ পরিবেশটা কত ভয়ানক! কারবালার ময়দানে হযরত হুসাইন (রা.) প্রতিপক্ষকে বলে পাঠালেন, আমাদেরকে যোহর নামায পড়ার সময় দাও। আসর তো পড়তেই পারেন নি, এর আগেই শাহাদাত বরণ করেছেন। সিমার বলেছিল, তোমার নামায কবুল হবে না। হুসাইন (রা.) বলেছিলেন, ধ্বংস হোক তোমাদের। নবী পরিবারের নামায যদি কবুল না হয়, তাহলে কার নামায কবুল হবে?

এ অবস্থাতেই তিনি যোহর নামায আদায় করেছেন। অথচ সেদিনকার কারবালায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতি ঘিরে রেখেছিল হযরত হুসাইন (রা.) কে, তা ব্যক্ত করার ভাষা কি মানুষের আছে? এরপরও নামায ছাড়েন নি। অথচ খেলাধূলাসহ বিনোদন নামক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে কত মানুষ নামায ছেড়ে দেয়। এজন্য আমাদের আক্ষেপ করা উচিত। এতে এতগুলো মানুষ নামাযকে ধ্বংস করে দিল। এসব ব্যপার নিয়ে কারও কোন দুঃখ নেই। দুঃখ হল আমার সামর্থক দল হেরে গেছে। খেলাধূলায় মেতে উঠতে গিয়ে কার কার কি লাভ-লোকশান হল তা কেউ কি একবার ভেবে দেখেছেন এবং এর দ্বারা পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক যুবকের যৌবন ধ্বংসের আশ্চর্য ঘটনা

নাজরানে এক যুবক দাঁড়িয়ে ছিল। সে দীর্ঘ ছিল। স্বাস্থ্যবান ছিল। এক ব্যক্তি তাকে দেখছিল। তখন যুবক তাকে বলল, বাবাজী কি দেখছ? বলল, বাপু তোমার যৌবন দেখছি। যুবক বলল, আমার যৌবনের উপর আল্লাহ্ও পেরেশান। আমার সৌন্দর্যে আল্লাহ্ও হয়রান।

ব্যস, মুখ থেকে এ বাক্য দুটি বের হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হল এক বিস্ময়কর ঘটনা। সবার চোখের সামনে তার উচ্চতা কমে আসতে লাগল। সাড়ে ছয় ফুট ছিল তার উচ্চতা। ছোট হতে হতে আধা হাত হয়ে গেল। মাত্র আধহাত। সাড়ে ছয় ফুট থেকে আল্লাহ্ তাআলা আধহাতে এনে দিয়েছেন। এ যৌবন এ শরীর এ উচ্চতা তোমার নয়। তুমি কার সাথে প্রতিযোগিতা করছ, কার সাথে লড়াই করছ?

নবীর প্রেমে মত্ত গাধা

খায়বার বিজয় হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণে গনীমতের সম্পদ এসেছে। সে সম্পদে ছিল একটি গাধাও। সে গাধা হযরতের খিদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি বংশীয় গাধা।

বললেন, কিভাবে?

বলল, আমার বাপ-দাদাদের উপর আম্বিয়ায়ে কিরামগণ সওয়ার হয়েছেন। আমি এ বংশের সর্বশেষ গাধা। আর আপনি সর্বশেষ নবী। আপনি আমাকে আপনার কাছে রেখে দিন।

বললেন, ঠিক আছে। এরপর গাধাটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাগে নিয়ে নিলেন এবং তিনিই এর উপর সওয়ার হতেন। কখনও প্রয়োজনে কাছে কেউ না থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 'ইয়াফুর' গাধাকে ডেকে বলতেন–যাও, আবু বকরকে ডেকে নিয়ে এস। ইয়াফুর গাধা সাথে সাথে ছুটে গিয়ে দরজায় আওয়াজ করত। ইয়াফুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বুঝে নিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকেছেন।

যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত প্রাপ্ত হন সেদিন ইয়াফুরের কান্না ছিল দেখার মত। সে পাগলের মত এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছিল। কোনভাবেই যখন সান্ত্বনা পাচ্ছিল না। এমনই ছিল তার বিরহ যাতনা।

কুরআন তেলাওয়াতের প্রভাব

বখতিয়ার কাকী (রহ.) কে তার মা সবক পড়ানোর জন্য মাদরাসায় নিয়ে গেছেন। উস্তাদ তাকে পড়াতে লাগলেন, আলিফ বা তা ছা। সে পড়তে লাগল–

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ -

এবং একাধারে পনের পারা শুনিয়ে দিল।

শিক্ষক বললেন, আরে বাবা, তোমার মা আমার সাথে মস্করা করলেন! ঘরে উস্তাদ ফিরে এসে মাকে বলল, মা! তোমার ছেলে আমকে পনের পারা শুনিয়ে দিয়েছে। সে পনের পারার হাফেয। পনের পারা কিভাবে হিফয করল। অথচ আপনি তাকে আলিফ বা তা ছা পড়ার জন্য পাঠিয়েছেন। বখতিয়ার কাকী (রহ.)-এর মা বললেন, আমি যখন তাকে দুধ পান করাতাম কুরআন শরীফ পড়ে পড়ে পান করাতাম। আমরা জানি, শিশুদের স্মৃতি শক্তি পরিচ্ছন্ন হয়। মা দুধ দিয়েছেন, সাথে কুরআনে কারীমের আয়াত দিয়েছেন। দুধের সাথে সাথে তার অন্তরে কুরআনে কারীমের আয়াতও অংকিত হয়ে গেছে। দেখুন কুরআনের প্রভাব।

তাওবার আপ্রাণ চেষ্টা, অতঃপর জান্নাত গমন

শিরক-এর পর সবচাইতে বড় গুনাহ হল মানুষ হত্যা। বুখারী শরীফে আছে, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি ৯৯ জনকে হত্যা করেছিল। এরপর তার মনে হল, আমি তাওবা করব। এরপর সে এক মূর্খকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আমার তাওবা কবুল হবে কি? সে বলল, তুমি ৯৯ জন মানুষ হত্যা করেছ। তোমার তাওবা আবার কিভাবে কবুল হবে? তুমি সোজা জাহান্নামী। সে বলল, তাহলে শত পুরা করে নিই। এ কাজ যখন করেছি এতে ভাঙতি রেখে লাভ কি? তাকে হত্যা করে শত পুরা করে নিল।

কিন্তু তার মনের ভেতর থেকে তাওবার আকুলতাটা গেল না। অবশেষে এক আলেমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল– আচ্ছা, আমি যদি তাওবা করি, তাহলে আমার তাওবা কি কবুল হবে? আলেম বললেন, বাবা, কেন কবুল হবে না? কিন্তু একটা শর্ত আছে। আন্তরিক মনোনিবেশসহ তাওবা করতে হবে। আর তাওবা পাকা হওয়ার জন্য ভাল পরিবেশের প্রয়োজন। এখানকার পরিবেশ যেহেতু ভাল নয়, তুমি অমুক এলাকায় চলে যাও। সেখানকার লোকজন ভাল। সেখানে গিয়ে তাওবা করলে তোমার তাওবা পাকা হবে।

তাবলীগ জামআত মূলত মানুষকে একথাই বলে। পরিবেশ পরিবর্তন কর, এক চিল্লার জন্য, চার মাসের জন্য, পুরনো পরিবেশ থেকে সরে পড়।

সে বলল, জি, আমি সেটাই চাচ্ছি। আলেম বললেন, তাহলে এখনই এখান থেকে বেরিয়ে পড়।

শত মানুষের হত্যাকারী বেরিয়ে পড়ল তাওবার উদ্দেশ্যে। চলতি পথে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন মৃত্যু চারদিকে থেকে তাকে ঘিরে ধরল। সে লক্ষ করল সময় শেষ। সে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। যখন মাটিতে পড়ে গেল তখন তার মনযিলের দিকে গড়াতে লাগল। অবশেষে মৃত্যু এসে যখন পা বসিয়ে দিল তখন সে তার দুই হাত সম্প্রসারিত করে সামনের দিকে ঝাপ দিল এবং এ অবস্থাতেই তার রূহ বেরিয়ে গেল। তার এ আচরণ আল্লাহ্ তাআলা এতটাই পছন্দ করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য তা সযত্নে হিফাযত করে রেখেছেন এবং আমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন।

এরপর দুনিয়াতেই তাকে নিয়ে মোকাদ্দমা বসল। জান্নাতের ফেরেশতাগণ উপস্থিত। উপস্থিত জাহান্নামের ফেরেশতাগণও। জাহান্নামের ফেরেশতা বলছে এ আমার কয়েদী। জান্নাতের ফেরেশতাগণ বলছে, এ

আমাদের মেহমান। জান্নাতের ফেরেশতাগণ বলছে, সে তাওবা করেছে। জাহান্নামের ফেরেশতাগণ বলছে, তাওবা পূর্ণ হয়নি। জাহান্নামের ফেরেশতাগণ বলছে, সে তার মনযিল পর্যন্ত পৌছায়নি। জান্নাতের ফেরেশতাগণ বলছে, সে পথ চলতে শুরু করে দিয়েছিল। কোনভাবেই ফয়সালা হচ্ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা তৃতীয় একজন ফেরেশতা পাঠালেন। তৃতীয় ফেরেশতা বলল, উভয় দিককার দূরত্ব মাপা হোক। যদি তার বাড়ির কাছাকাছি হয়ে থাকে তাহলে জাহান্নামী আর মনযিলের কাছাকাছি হয়ে থাকলে জান্নাতী। অথচ সে তার বাড়ির কাছাকাছিই ছিল। তার থেকে তার মনযিল ছিল দূরে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এ জমিনেরও মালিক। মালিক সারা জাহানের। যখন ফেরেশতাগণ মাপতে শুরু করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তার বাড়ি দিককার মাটিকে বললেন, প্রশস্ত হয়ে যাও। আর মনযিলের মাটিকে বললেন, সংকুচিত হয়ে যাও। এতে দেখা গেল, সে তার মনযিলের কাছাকাছি। আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করে দিলেন, আমার বান্দাকে জান্নাতে দিয়ে দাও।

আবার সুদ হয়ে যায় কিনা! তাই তো তিনি রোদে দাঁড়িয়ে....

একবার ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এক ব্যক্তির সাথে দেখা করতে গেলেন। তার দরজার কড়া নেড়ে সাথে সাথে দরজা থেকে দূরে সরে গেলেন এবং রোদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে দেখে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। সে বলল, হযরত ! ছায়ায় আসুন। হযরত ইমাম (রহ.) বললেন,না, ভাই! আবার এটা সুদ হয়ে যায় কি না! আসলে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সে ব্যক্তির কাছে ঋণ স্বরূপ কিছু পাওনা ছিল। তাই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর বাড়ীর ছায়া নেয়াটাকেও পছন্দ করেন নি। কাজেই পয়সার বিপরীতে মুনাফা গ্রহণ এটাই সুদ। কারণ, পয়সা কোন মাল নয়। সময়টাকে শরীয়ত সম্পদ হিসেবে দেখে না। আমি এক বছরের জন্য পয়সা দিয়েছি। অতএব এক বছরের বিপরীতে আমাকে কিছু পেতে হবে। এ এক বছর কোন সম্পদ নয়। শরীয়ত এটাকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে না।

আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুবই অল্প

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজে গেলেন, ভ্রমণকালে যখন তিনি চতুর্থ আকাশ অতিক্রম করছিলেন। তখন একটি

সৈন্যবাহিনীকে দেখতে পেলেন, যার না শুরু দেখা যাচ্ছিল, না শেষ। তাদের এক-একজনের দেহের উচ্চতা ছিল কয়েক হাজার মাইল দূরত্বের সমান।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামক জিজ্ঞেস করলেন, এ কি?

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আদমের যুগ থেকে আমার অহী নিয়ে আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। এখন আপনার পর্যন্ত এসে উপনীত হয়েছি। এখনও আসা-যাওয়া করছি। সে প্রথম দিন থেকে আমি এ বাহিনীকে এভাবেই অতিক্রম করতে দেখছি, আর আজ অবধি আমি এর কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ খুঁজে পাইনি। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ -

'আপনার রবের সৈন্যবাহিনী তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।' (৭৪ : ৩১) আমি কি করে জানব!

আইয়ূব আলাইহিস সালাম-এর ধৈর্যের প্রতিফল

হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালাম আঠার বছর রোগাক্রান্ত ছিলেন। শরীরের কোন অংশ এমন ছিল না, যাতে ব্যথা ও দাগ ছিল না। এ আঠার বছরে একটি রাতও এমন কাটেনি যে, তিনি ছটফট করেননি। এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁকে সুস্থ্যতা দান করলেন। তাঁর সব ক'জন স্ত্রী ও সন্তান মারা গেছেন। শুধু একজন স্ত্রী জীবিত রইলেন, যিনি তাঁর সেবা করতেন এবং মানুষের কাছে চেয়ে-চেয়ে এনে তাঁকে খাওয়াতেন।

আল্লাহ্ পাক হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালাম-এর যৌবন ফিরিয়ে দিলেন। স্ত্রী বাড়ি ফিরে দেখলেন, ঘরে এক সুদর্শন যুবক বসে আছে। বিপরীতে আইয়ূব আলাইহিস সালামকে কোথাও দেখতে পেলেন না। তিনি অস্থির হয়ে ওঠলেন। এদিক-ওদিক তাকালেন। কিন্তু আইয়ূব আলাইহিস সালাম নেই। যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে আমার রুগ্ন ও অক্ষম স্বামী ছিলেন। আপনি কি বলতে পারেন? হযরত আইউব আলাইহিস সালাম-স্ত্রীর কথা শুনে বললেন, আমিই তোমার সে স্বামী আইয়ূব । আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে পুনরায় যৌবন দান করেছেন।

ঘরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানালেন, তখন প্রত্যেকে আপন-আপন সামর্থ অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ নিয়ে হাজির হলেন। হযরত ওমর (রা.) ভাবলেন, এ-সময় আমি বেশকিছু সম্পদের অধিকারী আর আবুবকর গরিব। আবুবকরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আজ এটাই আমার মোক্ষম সুযোগ। আজ আমি এ সুযোগ হাতছাড়া করব না। অন্যথায় পরে আর কোন দিন হয়ত তাঁকে অতিক্রম করতে পারব না।

হযরত ওমর (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদকে দুটি ভাগ করলেন। অর্ধেক ঘরে রেখে বাকি অর্ধেক নিয়ে নবুওয়তের দরবারে উপস্থিত হলেন।

অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা.) একটি গাঠুরি নিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর হাবীব জানতেন, কে কতটুকু এনেছেন আর কতটুকু ঘরে রেখে এসেছেন।

যদি প্রশ্নটা এটাই হত যে, বল আবু বকর, তুমি কি এনেছ? বল ওমর, তুমি কি এনেছ? তাহলে এ প্রতিযোগিতায় হযরত ওমর জিতে যেতেন। আর প্রশ্ন হওয়ারও দরকার ছিল এটাই। যেমনটি আমরা যখন মসজিদে চাঁদা তুলি, তখন দাতাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করি না যে, ভাই ঘরে কি রেখে এসেছ? বরং জিজ্ঞেস করি, ভাই কি দিচ্ছ?

কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন পালটে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওমর, ঘরে কি রেখে এসেছ?

হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মোট সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এসেছি আর বাকি অর্ধেক ঘরে রেখে এসেছি।

হযরত আবুবকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রেখে এসেছেন?

আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি আর সব নিয়ে এসেছি।

তাফসীরে আযীয-এ আছে, হযরত আবু বকর (রা.) ঘরের বেড়া হাতড়াচ্ছিলেন। মেয়ে জিজ্ঞেস করল, আব্বাজান, আপনি কি করছেন? বললেন, একটা সুঁই বেড়ার সাথে ঝুলানো ছিল। ভাবছি, সেটা আবার ঘরে রয়ে যায় কিনা।

হযরত আবুবকর (রা.) এবারও জয়যুক্ত হলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবুবকর, আমি জীবনেও কোন কাজে তোমাকে অতিক্রম করতে পারব না।

কারুণের শাস্তি

মূসা আলাইহিস সালাম বয়ান করছিলেন। সামনে বিপুল শ্রোতা। কারুনও উপস্থিত। এক পর্যায়ে কারুন দাঁড়িয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করতে শুরু করল, ওহে মূসা, কেউ যদি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যেনা করে, তাহলে তার শাস্তি কি?

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, তাকে পাথর মেরে-মেরে হত্যা করা হবে।

কারুণ বলল, এ মহিলা কি বলছে শোন।

কারুন মহিলাকে দাঁড় করাল এবং বলল, তুমি সাক্ষ্য দাও।

মহিলা সাক্ষ্য দিতে উদ্যত হল। কিন্তু যেই মাত্র নবুওতের চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হল, সাথে সাথেই তার সর্বাঙ্গ কেপে ওঠল। সে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। অগত্যা বলল, আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি এমনিতেই একজন পাপিষ্ঠা নারী। আমি একজন নবীর বিরুদ্ধে অপরাধ আরোপের দায় মাথায় নিয়ে মরতে চাই না। মহিলা সাফ-সাফ বলে দিল। আপনার উপর অপবাদ আরোপের জন্য কারুন আমাকে অর্থ দিয়ে উস্কে দিয়েছে।

হযরত মূসা আলাইহি সালাম সিজদায় লুটিয়ে পড়ে বলতে শুরু করলেন :

হে আল্লাহ্, তোমার নবীর সাথে এ কি ঘটনা ঘটে গেল!

আল্লাহ্ তায়ালা বললেন, আমি জমিনকে তোমার অনুগত বানিয়ে দিলাম; তুমি কারুনকে ধসিয়ে দাও।

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে জমিন , কারুনকে পাকড়াও কর।

সাথে সাথে জমিন কারুনকে ধরে ফেলল এবং কারুন মাটিতে ধসে গেল।

কারুন বলল, মূসা, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও।

কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম জমিনকে বললেন, একে ভাল করে ধর।

কারুন আরও ভিতরে ঢুকে গেল। কারুন আবারও ক্ষমার আবেদন জানাল।

মূসা আলাইহিস সালাম পুনরায় বললেন, মাটি, একে ধর।

কারুন আরও ধসে গেল।

এভাবে কারুন ক্ষমার আবেদন করতে থাকল আর আস্তে-আস্তে মাটিতে ধসে যেতে থাকল।

যখন কারুন সম্পূর্ণ ধসে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, মূসা তোমার অন্তরটা এতই শক্ত! তুমি এত পাষাণ!

লোকটা বারবার ক্ষমার আবেদন-নিবেদন করা সত্বেও তুমি ক্ষমা করলে না!

আমি আমার মর্যাদা ও প্রতাপের কসম করে বলছি, যদি আমার কাছে সে একটি বার ক্ষমার আবেদন করত তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে বের করে দিতাম।

মা তোমার জন্য এ মর্যাদা-ই যথেষ্ট

হযরত ফাতেমা (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর নিতে তাঁর বাড়ি গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আসব কি মা, সাথে আরেক জন আছে?

হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, একজন না-মাহরাম পুরুষ আপনার সাথে আছে। আমার ঘরে পর্দার করার মত কোন চাদর নেই। কিন্তু দোজাহানের সরদারের মেয়ের ঘরে পর্দা করার মত কোন চাদর নেই! তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাঁধ থেকে চাদরটা খুলে ভেতরে পাঠিয়ে বললেন, নাও মা, আমার চাদর দ্বারা পর্দা কর। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করলেন। অসুস্থ মেয়েকে গলায় জড়িয়ে নিলেন। চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ মা? হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আগে অনাহারী। এখন রোগও এসে পড়েছে। না খাবার আছে, না ঔষধ আছে!

আমার ভাই ও বোনেরা! যে নবী তায়েফে পাথর খেয়েও কাঁদেননি, কন্যার চোখের পানি তাঁকে গলিয়ে দিল! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। এরপর দীর্ঘ সময় মেয়েকে আদর দিলেন। এরপর বললেন, তুমি কাঁদছ কেন মা! সে সত্ত্বার কসম, যিনি তোমার পিতাকে সত্য নবী বাানিয়েছেন, আজ তিন দিন চলছে তোমার পিতা এক টুকরা রুটিও মুখে দেননি। তুমি ক্ষুধার্ত কিন্তু তোমার আব্বাজানও এর চেয়ে ভিন্নতর নন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই ঘোষণা দিলেন, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ শোনাব না মা! বাদ দাও এ ক্ষুধা রোগের ভাবনা। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে জান্নাতের নেত্রী বানিয়ে দিয়েছেন। তোমার জন্য এ মর্যাদা-ই যথেষ্ট।

সুন্নাত অনুসরণের প্রতিদান

এক ধোপার ছেলে চিল্লায় গেল। তারই গ্রামের এক মেয়ের সাথে তার বিবাহ ঠিক হয়েছিল। দিন-তারিখ নির্ধারিত হওয়ার পর ছেলেটি চিল্লায় চলে গিয়েছিল। যখন ফিরে এলো, তখন তার মুখে দাড়ি। যাওয়ার সময় ছিল ক্লিনসেভ।

বরযাত্রী কনের বাড়ি পৌছে গেল।

আমাদের এখানে নিয়ম আছে, বিবাহ অনুষ্ঠানে জমিদারও উপস্থিত থাকেন। অতএব নিয়ম অনুযায়ী এ অনুষ্ঠানেও স্থানীয় জমিদার এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বরযাত্রা কনের বাড়ি গিয়ে পৌছুলে হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। আমরা যখন বরকে দেখেছিলাম, তখন তার মুখে দাড়ি ছিল না। এখন দাড়ি আছে। আগে দাড়ি মুণ্ডাও, এরপর মেয়ে দেব। বরপক্ষের সবাই বিষয়টি মেনে নিল।

ভাই মানল।

পিতা মানল।

চাচা মানল।

সবাই বলল, এটা কোন সমস্যাই নয়- কয়েক মিনিটের কাজ মাত্র। আল্লাহ্ তায়ালা অনেক দয়ালু। তিনি ক্ষমা করে দেবেন। সবাই বরকে বলল, তুমি দাড়ি কেটে ফেল; বিবাদ মিটে যাক।

কিন্তু বর বলল, গলাটা কেটে ফেলুন। ঘাড়টা উড়িয়ে দিন। তবু দাড়ি কাটব না। এ হতে পারে না; হওয়ার মত বিষয় নয়।

কনেপক্ষ বলল, আমরা মেয়ে দেব না।

বর বলল, না দাও তাও ভাল। আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে নারাজ করতে পারব না। দাঁড়ি কাটতে পারব না।

হাঙ্গামা বেড়ে গেল।

ঘটনাটা সম্পূর্ণ দেখার পর হঠাৎ জমিদার দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, বরপক্ষের সবাই আমার বাংলোয় আসুন। এ ছেলের কাছে আমার মেয়েকে বিবাহ দেব। এ প্রতিশ্রুতি আমি আপনাদের দিচ্ছি।

এ ঘোষণায় সমস্ত বরযাত্রী জমিদারের বাংলোয় চলে গেল। জমিদার তার সুন্দরী ষোড়শী মেয়েটিকে দাড়িওয়ালা যুবকের কাছে বিবাহ দিয়ে সাথে পাঠিয়ে দিলেন।

মানুষ বলে, কি করব, পরিবেশ-প্রতিবেশ দেখতে হয়।

আমি বলি, একথা বলুন, আল্লাহ্‌র রাসূলকে দেখতে হয়, যার অফাদারি-ই সত্য এবং জগতের অন্য সকলের অফাদারি মিথ্যা।

শিশুটি বলল-আমরা কি দুনিয়াতে খেলতে এসেছি?

বাহলুল (রহ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক জায়গায় দেখলেন, একটি শিশু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আরেক শিশু আখরোট খেলছে। তিনি মনে করলেন, এ শিশুটির কাছে আখরোট নেই বলে কাঁদছে। মনে-মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমি একে আখরোটের ব্যবস্থা করে দেব।

বললেন, বেটা তুমি কেঁদো না, আমি তোমাকে আখরোট দেব, তুমিও খেল।

শিশুটি বলল, বাহলুল, আমরা কি দুনিয়াতে খেলতে এসেছি?

এ বয়সের একটি শিশু এমন উত্তর দেবে বাহলুলের চিন্তায়ও ছিল না। তিনি পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আমরা কি করতে এসেছি?

শিশুটি বলল, আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এসেছি।

বাহলুল বললেন, ব্যস, তুমি এখনও অনেক ছোট। তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। এ মনযিলে আসতে তোমার এখনও বহু দেরি আছে।

শিশুটি বলল, আরে বাহলুল, আমাকে ধোঁকা দিও না। আমি আমার মাকে দেখেছি, তিনি সকালবেলা যখন আগুন জ্বালান, তখন প্রথমে ছোট লাকড়ি দ্বারা আগুন ধরান। পরে বড় লাকড়ি চুলায় দেন। সেজন্য আমার ভয় লাগছে, জাহান্নামের আগুন আমার দ্বারাই ধরানো হয় কিনা আর বড়দেরকে আমার উপরে নিক্ষেপ করা হয় কিনা। শিশুটির মুখে একথা শুনে বাহলুল বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

রোমান মেয়ে। রূপের বাহার-ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

হাবীব ইবনে ওমায়র (রহ.) একজন তাবেয়ী। সাহাবাদের শিষ্য। খুবই সুদর্শন পুরুষ। বন্দি হলেন। শত্রু পক্ষের দশ ব্যক্তিকে কতল করে ধরা পড়লেন। রোমান নেতা বললেন, এক আমি গোলাম বানাব। কারাগারে আটক করে বললেন, যদি খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তাহলে আমার একটি মেয়ে তোমাকে দিয়ে দেব। আমার রাজ্যের অংশও তোমাকে দান করব।

কিন্তু তিনি বললেন, যদি গোটা জগতটাও দিয়ে দাও, তবু তা হবে না। কাফেররা বেহায়া-ই হয়ে থাকে। হায়া-লজ্জা সবটুকুই আছে ইসলামে। রোমান নেতা মেয়েকে বললেন, এর দ্বারা অপকর্ম করাও। যখন এ-কাজে লিপ্ত হবে, তখন ইসলামও ছেড়ে দেবে।

রোমান মেয়ে। রূপের বাহার। এদিকে রোমের রূপ, অন্যদিকে আরবের যৌবনে রূপের আগুন উত্তপ্ত। যৌবনের শক্তিও উন্মত্ত। কক্ষে শুধুই দুজন। অন্য কেউ নেই।

এ মুহূর্তে এখানে সব ধরণের বাধা-প্রতিবন্ধকতা অনুপস্থিত। রূপসী রাজকন্যা আহ্বান জানাচ্ছে আর যুবক দৃষ্টিকে অবনত রাখার স্বাদ গ্রহণ করছে। চারিত্রিক পবিত্রতার স্বাদ তাঁর জানা আছে। তাই চোখ দুটি উপরে উত্থিত হওয়ার নামই নিচ্ছে না।

মেয়েটি তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করল। রূপ -যৌবনের প্রতিটি তীর পরীক্ষা করল। ষড়যন্ত্রের সব ক'টি জাল নিক্ষেপ করল। কিন্তু পবিত্রতার তরবারি প্রতিটি জালের সবকটি তার ছিন্নভিন্ন করে দিল। প্রতিটি তীরকে ব্যর্থ করে দিল।

অবশেষে তিন দিন পর মেয়েটি যৌবন নামক অস্ত্র পরিত্যাগ করে জিজ্ঞেস করল,'বলতো তোমাকে আমার থেকে কে ঠেকিয়ে রাখে? আজ তিনটি দিন অতিবাহিত হল, তুমি একটি বারের জন্যও আমার প্রতি চোখ তুলে তাকালে না! তাহলে ঠেকাল কে?

হাবীব (রহ.) বললেন, আমাকে ঠেকান তিনি :

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ -

'যাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না, নিদ্রাও না।' (২ : ২২৫)

যিনি আমার থেকে উদাসীন নন। আমি তাঁর থেকে উদাসীন। তিনি আমার প্রতিপালক। আরশের উপর বসে আমাকে দেখছেন যে, আমার ভালবাসা জয়ী হয়, না বান্দার যৌন কামনা-বাসনা। আমাকে সামনে রাখে, না শয়তানকে। শোন হে মেয়ে, আপন প্রতিপালকের প্রতি আমার লজ্জা আসছে। তাই আমি আমার শক্তিকে দমিয়ে রেখেছি। মেয়েটি কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে পিতাকে বলল :

إِلَى أَيْنَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى حَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَنْظُرُ -

'আমাকে কার কাছে পাঠালেন? কোন লোহার কাছে, না পাথরের কাছে?সে খায়ও না, তাকায়ও না।'

আমি কিভাবে তাকে ঘায়েল করব? অথচ আমার সর্বশক্তি নিঃশেষ করেছি?

তাওবা-ই নাজাতের পথ

আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে ডাকবেন, যে তাওবা করে মৃত্যুবরণ করেছে। বলবেন, আমার বান্দা, তুমি কি এ গুনাহটি করেছ? বলবে, হ্যাঁ করেছি।

আল্লাহ্ তায়ালা একটি-একটি করে গুনাহের কথা উল্লেখ করবেন আর জিজ্ঞেস করবেন। বান্দা কাঁপতে থাকবে যে, আহ, আমার বুঝি রেহাই নেই। তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে।

শেষে আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, শোন, তুমি যত গুনাহ করেছ, আমি তোমার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন বান্দা খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলবে, হে আল্লাহ্ আরও অনেক গুনাহ বাদ পড়ে গেছে, যেগুলো আপনি উল্লেখ করেননি।

এটাই হল আল্লাহ্ পাকের অপার দয়া যে, তাওবা করে সত্যের পথে আনুগত্যের পথে ফিরে এলে তিনি বান্দার অতীত দিনের গুনাহগুলোকেও নেকিতে পরিণত করে দেন।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক রাতের পাহাড়ায় জান্নাত অবধারিত

হুনাইনের যুদ্ধের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আজ রাত কে পাহারা দেবে? হযরত আনাস ইবনে মুরশিদ আল-গানামি দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি পাহারা দেব।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, যাও, এ ঘাঁটিটির উপর গিয়ে দাঁড়িয়ে যাও।

তিনি গেলেন এবং সারারাত পাহারা দিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযর নামাযের সালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আমাদের আজকের পাহারাদারের খবর কি?

লোকেরা বলল, এখনও আসেনি। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূরপানে তাকালেন এবং দেখলেন, ধূলি উড়ছে।

তিনি বললেন, ওই তো আসছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়নামায থেকে উঠতে -না উঠতেই প্রহরী এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায়ই নবীজিকে সালাম দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজকের পর যদি তুমি আর কোন আমল না-ও কর, তবু তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।

ঘরে বসে সারা জীবন ইবাদত করে জান্নাতের সুসংবাদ নেই। দেখুন আল্লাহ্‌র পথে এক রাতের পাহারায় জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে।

ঘোড়া নামিয়ে দেয়া আমাদের কাজ নদী পার করানো আল্লাহ্‌র কাজ

হযরত আলী ইবনে হুজুর (রহ.) সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ালেন। সাথে মুজাহিদ বাহিনী। বাহরাইন আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। পথে মধ্যখানে এ নদী।

নদী পাপারের কোন ব্যবস্থা নেই।

জাহাজ নেই। নৌকা নেই।

নৌকার ব্যবস্থা করতে গেলে কালক্ষেপণ হয়ে যাবে। শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে যাবে।

তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। দু-রাকাত নফল পড়লেন। এরপর হাত তুললেন ইয়া আল্লাহ্ আমরা তোমার পথে জিহাদ করতে এসেছি। আমরা তোমরা নবীর গোলাম। আমাদেরকে এ নদী পার হতে হবে; অথচ আমাদের কাছে কোন ব্যবস্থা নেই। সমস্যাটা তোমার নয়-আমাদের। আমাদের জন্য তুমি রাস্তা খুলে দাও।

দু'আ শেষে তিনি উঠে মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে যার-যার ঘোড়া নদীতে নামিয়ে দাও।

কেউ বললেন না, মাননীয় সেনাপতি, মাথাটা কি আপনার ঠিক আছে?

ঘোড়া সমুদ্রে নামিয়ে দিলে ডুবে যাব। এ আপনি কি বলছেন?

তারা বরং বলল ঠিক আছে, আমাদের সেনাপতি দু-রাকাত পড়ে নিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন।

ঘোড়া নামিয়ে দেয়া আমাদের কাজ।

নদী পার করানো আল্লাহ্‌র কাজ।

বাহিনীর সকল মুজাহিদ তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম। সবাই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমরা পানির উপর দিয়ে ঘোড়াসহ ছুটে চললাম। এভাবেই আমরা নদী পার হয়ে এলাম।

কুরআন পাকের বৈশিষ্ট্য

মক্কার কুরাইশরা দিনের বেলা সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র রাসূলকে গালি দিত। ইসলামের ধ্বংসের জন্য নানারূপ পরিকল্পনা করত। কিন্তু রাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাজ্জুদে কুরআন পাঠ করতেন তখন তারা পা টিপে-টিপে এসে লুকিয়ে-লুকিয়ে কুরআন শুনত। আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, আখনাস ইবনে শরাইহ এরা।

এমন এক আকর্ষণ রেখেছেন আল্লাহ্ পাক কুরআনের মাঝে।

এক সাহাবী ছিলেন আম্মার (রা.)। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। লোকেরা তাকে বলল, আমাদের এক কুরাইশ যুবক আছে তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি তাকে এড়িয়ে চল।

আম্মার মনে-মনে ভাবলেন, যুবককে বোধহয় জিনে ধরেছে, আমি জিন ছাড়াতে জানি।

বললেন, ঠিক আছে, আমি তার জিন ছাড়িয়ে দেব।

তাঁরই বর্ণনা, আমি মসজিদে এলাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁকে চিনতাম না। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা উত্তর দিল, এ-ই সেই যুবক, তুমি যার জিন ছাড়াতে এসেছ।

আম্মার (রা.) বললেন, আমি তাঁর প্রতি ভালভাবে তাকালাম। এত সুন্দর !এত রূপবান! এত মর্যাদাবান! এর চিকিৎসা হওয়াই দরকার।

আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, চিন্তা করো না। অনেক বড় বড় জিন আমি তাড়িয়েছি। তোমারটাও ছাড়িয়ে দেব।

তিনি গভীর দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকালেন। কুরআন পড়লেন না।

শুধু খুতবা পাঠ করলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। আমি তাঁর কাছে ক্ষমার আকুতি জানাচ্ছি, তাঁর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিচ্ছি এবং তাঁর উপর ভরসা রাখছি। আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে বিভ্রান্তকারী কেউ নেই। আর যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন, তাকে হিদায়াত দানকারীও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু খুতবাটুকু পাঠ করলেন। আম্মার বলেন, এতটুকু কানে প্রবেশের সাথে সাথে আমার অন্তরটা টুকরা-টুকরা হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র শপথ, এমন কথা জীবনে আর আমি শুনিনি। বললাম, আবার পাঠ করুন।

তিনি কথাগুলো পুনরায় পাঠ করলেন আমি এরপরই মুসলমান হয়ে গেলাম।

জাগতিক জীবনে এমন দৃষ্টান্ত বিরল

এক গোলাম। মনিবের বাগান দেখাশোন করাই ছিল তার দায়িত্ব।

আনারের বাগান।

একদিন মনিব বাগানে এসে বললেন, একটি আনার নিয়ে এস।

গোলাম এক গাছ থেকে একটি আনার এনে মনিবের হাতে দিল। মনিব আনারটি ভেঙ্গে কয়েকটি দানা মুখে পুরে কামড় দিয়েই বললেন, ধ্যাত, টক! বড় আজব মানুষ তুমি! দশটি বছর যাবত বাগানে কাজ করছ আর আজও জান না কোন গাছের আনার টক, কোনটা মিষ্টি।

গোলাম বলল, টাক-মিষ্টি যাচাই করে দেখতে এবং খাওয়ার অনুমতি আমাকে দিলেন কবে? আমি এ বাগানে দশ বছর যাবত কাজ করছি কিন্তু এর ফল আমার জন্য হারাম! আমি কিভাবে বলব, কোনটা মিষ্টি আর কোনটা টক?

শুনে মনিবের চক্ষু চড়কগাছ!

এজন্যই ছিল সে-যুগের সততা।

নিচ থেকে উপর পর্যন্ত। আর আজ?

এক কোটিপতি আরবের যিন্দেগী পরিবর্তন

পনের বছর আগে মদীনা থেকে এক শায়খ এসেছিলেন। নাম তাঁর সালেম কুরাবি। মদীনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন। সে-সময় অর্থাৎ আজ থেকে পনের বছর আগে এক লাখ রিয়াল বেতন পেতেন।

তিনি আমাদের পাকিস্তান এসে বিশ দিন সময় লাগালেন।

মাত্র বিশ দিন।

মদীনার মানুষ কি জানে না সুদ হারাম?

নিশ্চয়ই জানে।

কিন্তু মানার জন্য বিশ দিনের সময় লাগানো দরকার ছিল।

তা তিনি করলেন।

মাত্র বিশ দিন–একচিল্লাও নয়।

বিশ দিন পর চলে গেলেন। গিয়ে ব্যাংক ছেড়ে দিলেন। চাকুরি থেকে ইস্তফা দিলেন। মদীনার ব্যাংকিং আইন এমন যে, চাইলেই চাকুরি ছাড়া যায় না। ছাড়লে জরিমানা দিতে হয়।

এ শায়খ চাকুরি পরিত্যাগ করে জরিমানা আদায় করে দিলেন–অবলীলায়, নিশ্চিন্তে। এর জন্য তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করতে হল। তিনি জরিমানার পরিবর্তে সব সম্পত্তি ব্যাংকে দিয়ে দিলেন এবং নিজে মুক্ত হয়ে গেলেন।

মদীনার বাইরে তার একটি কাঁচা বাড়ী ছিল।

তিনি সেখানে গিয়ে ওঠলেন।

আমি ১৯৮৯ সালে যখন হজ্বে গেলাম, তখন তাঁর এ বাড়িতেই মেহমান হলাম। পুরাতন একটি জীর্ণ ঘর। মদীনার ছয় সাত কিলোমিটার বাইরে মফস্বল অঞ্চলে অবস্থিত।

এবার উপার্জনের জন্য পেশা কি ধরলেন?

ছাগল ব্যবসা।

পল্লী অঞ্চল থেকে ছাগল কিনে মদীনার বাজারে এনে বিক্রি করলেন। পাঁচ শত রিয়াল লাভ হল।

যার মাসে বেতন ছিল এক লাখ রিয়াল, তিনি পাঁচ শত রিয়াল মুনাফা নিয়ে ঘরে ফিরলেন।

ঘরে গিয়ে নোটগুলো স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন।

উভয়ে কেঁদে ফেললেন।

কেন কাঁদলেন?

জীবনে এ-ই প্রথম ঘরে হালাল রুজি প্রবেশ করল।

তারা আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

কোথায় পাঁচ শত রিয়াল আর কোথায় এক লাখ রিয়াল।

তবু স্বামী স্ত্রী আনন্দে কাঁদছেন যে, আজ আমাদের ঘরে হালাল রুজি প্রবেশ করেছে।

সে-বছরই আমি হজ্বে গিয়েছিলাম।

তিনি আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে খানা খাওয়ালেন।

এ আরব শায়খ তো জানতেন, সুদ হারাম।

কিন্তু আগে তা ছাড়েননি কেন? হিযরত তথা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করা ঈমানের সাগরে ঢেউ তোলে, যে-ঢেউ প্রতিটি বস্তুকে খড়ের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এ শায়খের যিন্দেগী তা-ই ঘটেছে। তিনি দাওয়াতের মেহনতে ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে ঈমানের দরিয়ায় প্রবেশ করে যাত্রা শুরু করলেন।

হারাম বর্জনে আল্লাহ্ তায়ালার খাজানা খুলে গেল

সুলতান আবদুল আযীয (রহ.) দেশ থেকে চুরি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। চোরদেরকে ধরে-ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। এক সউদি নাগরিক আমাকে বলেছে, সুলতান আবদুল আযীয যখন মক্কা আসতেন, তখন বাইতুল্লাহর দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়তেন।

তাঁর হাতে তরবারি থাকত। বসে-বসে তিনি ক্রন্দন করতেন।

তার এক ওস্তাদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত কাঁদছ কেন?

তিনি বললেন, আমি দেশ থেকে চুরি বন্ধ করে দিয়েছি। এখন কেউ চুরি করতে পারে না। কিন্তু আমি এখন তাদের খাওয়াব কোথা থেকে? তাদের রুটি আসবে কোথা থেকে? এ ভাবনায় আমি আল্লাহ্‌র দরবারে ক্রন্দন করছি যে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার আদেশ পালন করেছি, তোমার আইন বাস্তবায়ন করেছি। এখন তুমি তোমার বান্দার রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে দাও।

আল্লাহ্ পাক সউদী আরবের মুসলমানের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াতে শুরু করলেন।

তাদের মাটির তলদেশ থেকে খনি বের করে দিয়েছেন।

এটা হারাম বর্জন করে হালালের উপর অটল থাকার বরকত।

এটা আল্লাহ্‌র আইন মান্য করা ও বাস্তবায়নের সুফল। এখন তারা অর্থ ব্যয় করার খাত খুজে পাচ্ছে না।

এরপরও কি জিজ্ঞেস করবেন, হারাম, পরিত্যাগ করলে খাব কোথা থেকে?

একটি গল্প- আমাদের শিক্ষণীয়

ছোট একটি ইংরেজি বইয়ে একটি গল্প পড়েছিলাম। বইটির নাম ঠিক স্মরণ নেই। গল্পটি হল : দু'টি কুকুর; একটি শহুরে, অপরটি জংলি।

শহুরে কুকুরের মনে সখ জাগল, বনে বেড়াতে যাবে।

সে বনে গেল। বনে তার জংলি কুকুরের সাথে সাক্ষাত ঘটল। অল্প সময়ে দু'জনের মাঝে আলাপ -পরিচয় ও ভাব জমে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠল।

শহুরে কুকুর মোটা-তাজা ও স্বাস্থ্যবান।

জংলি কুকুর হালকা-পাতলা ও শীর্ণ।

জংলি কুকুর জিজ্ঞেস করল,ভাই, তুমি কোথা থেকে এসেছ? কোথায় থাক?

বলল, আমি শহরে থাকি, শহর থেকেই এসেছি।

আচ্ছা, তুমি কি খাও?

অনেক ভাল ভাল খাবার-পরাটা, ডিম, গোশত ইত্যাদি উন্নতমানের খাবার খাই আর দুধ পান করি। এখন তুমি বল তোমার খাদ্যতালিকা কি? তুমি কি খাও?

জংলি কুকুর আক্ষেপের নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, আমার আবার খাদ্যতালিকা! থাকি জঙ্গলে। পরাটা, ডিম, গোশতের কথা বাদ দাও। শুকনা হাড়ও মেলে না। দেখছ না, কেমন কংকালমার্কা শরীর। আমাকে তুমি শহরে নিয়ে যাও; আমারও ডিম-মাংস খেতে খুব ইচ্ছা হয়।'

শহুরে কুকুর বলল, ঠিক আছে চল।

দু'জনে রওনা হল। হঠাৎ জংলি কুকুরের চোখে পড়ল, শহুরে কুকুরের গলায় একটি শিকল লাগানো আছে। জিজ্ঞেস করল, ভাই, তোমার গলায় এটা কি?

এটা শিকল।

শিকল আবার কি? এটা দিয়ে কি হয়? এটা আমার গোলামির জিঞ্জির।

জংলি কুকুর জানে না, গোলামি কাকে বলে।

জিজ্ঞেস করল, ভাই, গোলামি আবার কি জিনিস!

শহুরে কুকুর বলল, আমি এক সাহবের চাকরি করি, তাকে পাহারা ডিউটির বিনিময়ে তিনি আমাকে ডিম,গোশত, পরাটা খাওয়ান এবং মাঝে-মধ্যে দুধও পান করান।

শুনে জংলি কুকুর বলল, তা হলে ভাই, আমার ডিম-গোশতের প্রয়োজন নেই। তোমার এ গোলামির ডিম-গোশত অপেক্ষা আমার আযাদির উপবাসই বরং উত্তম। যাও ভাই, তুমি তোমার ডিম-পরাটা খাও গিয়ে; আমি বনে ফিরে যাই।

বন্ধুগণ! আজ আমরাও শহুরের কুকুরের মত ভোগ-বিলাসিতার জন্য গোলামির জীবনকে বরণ করে নিয়েছি। আমরা সুখ আর মর্যাদা বলতে

বুঝি, বিপুল ধন-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি। এরজন্য আমরা গলায় পরিয়ে নিয়েছি গোলামির শিকল। আমরা কাফের-মোশরেকদের গোলামির বিনিময়ে ডিম- গোশত আর কোরমা-পোলাওর ব্যবস্থা করছি। তাতে যে আমরা স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, সে অনুভূতি আমাদের নেই। আজ আমাদের একমাত্র ব্যস্ততা উপার্জন করা আর ভোগ করা।

এ-প্রসঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষের উদরপূর্তি আর যৌনকামনা চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকবে না।'

আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাদেরকে সে অভিশপ্ত জীবন থেকে রক্ষা করেন।

হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাত

হযরত হামযা (রা.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর প্রিয় চাচা। আবার পরস্পর দুধভাইও ছিলেন। দুজন একই মহিলার দুধ পান করেছিলেন। দয়ালু সঙ্গী এবং সহযোগীও ছিলেন।

অহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.) দুই হাতে তরবারি নিয়ে লড়াই করছিলেন, প্রতিপক্ষের যে-ই সামনে আসছে, সে-ই মৃত্যুর দিকে চলে যাচ্ছে।

ওয়াহশি ইবনে হারব এক কাফের গোলাম ছিল। লোকটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিল। হযরত হামযা (রা.) যখন সামনে এলেন, তখন লোকটি পেছন থেকে বর্শা ছুড়ে মারল। বর্শা হযরত হামযা (রা.)-এর পেটে গিয়ে বিদ্ধ হল এবং এতে তাঁর নাড়িভুড়ি বেরিয়ে গেল।

হযরত হামযা (রা.) মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহীদ হয়ে গেলেন। কাফেররা তাঁর নাক-কান কেটে ফেলল। বুকটা চিরে কলিজাটা বের করে ফেলে দিল।

যুদ্ধ শেষ হল। মুসলমানরা বিজয় অর্জন করলেন। শহীদদের অনুসন্ধান শুরু হল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন দেখ কে, কে শহীদ হয়েছে?

অনুসন্ধান নেয়া হল। হযরত হামযা (রা.) জীবিতদের মাঝে নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার চাচাজান গেলেন কোথায়, তোমরা খোঁজ নাও।

সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি শহীদ হয়েছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুটে এলেন। চাচার লাশ দেখলেন। তিনি এমন কাঁদলেন যে, অন্য কোন সময় এমন শব্দে কেঁদেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর সে কান্না অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা গিয়েছিল।

নবীজির কান্না দেখে সাহাবাগণ কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কত ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি চাচার মৃত্যুতে! ঘটনা এতটুকু গড়াল যে, আল্লাহ্ পাক আসমান থেকে জিবরীল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দিলেন যে, যাও, আমার নবীকে সান্ত্বনা ও সুসংবাদ দাও, আপনি বিচলিত হবেন না, আল্লাহ্ আরশে আপনার চাচার নাম লিখে দিয়েছেন ঃ

أَسَدُ اللّٰهِ وَأَسَدُ رَسُوْلِهٖ ـ

'আল্লাহ্‌র সিংহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের সিংহ।'

হযরত হামযা (রা.) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সিংহ উপাধি পেলেন।

এবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ত্বনা পেলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তরবার চাচা হযরত হামযা (রা.)-এর জানাযা পড়েছেন। এক-একজন শহীদের জানাযা আনা হত আর তুলে নেয়া হত। এভাবে সত্তরজন শহীদের নামাযে জানাযা পড়া হল। কিন্তু হযরত হামযা (রা.)-এর জানাযা সামনেই রয়ে ছিল।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাতে তাঁকে কবরে নামালেন।

যুদ্ধে জয়লাভ করে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় প্রবেশ করলেন, তখন ঘরে-ঘরে মহিলাদের কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

কারও বাবা শহীদ হয়েছেন।

কারও চাচা শহীদ হয়েছেন।

কারও ভাই শহীদ হয়েছেন।

কারও বেটা শহীদ হয়েছেন।

কারও স্বামী শহীদ হয়েছেন।

মরণে মানুষ মাত্রই ব্যথিত ও দুঃখিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখেও পানি এসে পড়ল।

তিনি বললেন, আমার চাচার জন্য কাঁদবার মত কেউ নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোটা বংশ তাঁর বিরুদ্ধবাদী ছিল। মাত্র দুজন লোক তাঁর দলভুক্ত ছিলেন। একজন হযরত আলী (রা.), অন্যজন হযরত হামযা (রা.)। বাকি সবাই তার প্রতিপক্ষ ছিল এবং সব ক'জনই মক্কায় ছিল। তিনি একা মদীনা এসেছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর চাচার জন্য কাঁদবে কে?

তাঁর চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, আহ, আমার চাচাজানের জন্য ক্রন্দনকারী কেউ নেই!

হযরত সা'দ ইবনে উবাদ (রা.) বিষয়টি অনুভব করে আনসারি মহিলাদের বললেন, যাও তো, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর ঘরের দরজায় বসে তাঁর চাচার জন্য কাঁদ।

মৃতের জন্য বিলাপ করা তখন পর্যন্ত হারাম ঘোষিত হয়নি।

আনসারি মহিলারা এলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর ঘরের দরজার সামনে বসে কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার শব্দ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, তোমরা কার জন্য কাঁদছ?

মহিলারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার চাচার জন্য কাঁদবার মত কেউ নেই। আমরা তাঁর জন্য কাঁদতে এসেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা চলে যাও। আল্লাহ্ তোমাদের ঘরগুলোকে আবাদ রাখুন। তোমরা ফিরে যাও। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহমত করুন।

পিতার আদেশের মর্যাদা

হযরত আতেকা (রা.) খুবই সুন্দরী মহিলা ছিলেন। বিদ্বান ও কবি হিসেবে তাঁর বেশ সুখ্যাতি ছিল। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.)-এর পুত্র হযরত আবদুর রহমান(রা.)-এর সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। আবদুল্লাহ (রা.)-ও বেশ সুদর্শন যুবক ছিলেন। বিবির ভালবাসায় এতই মাতোয়ারা

হলেন যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়ার কাজে অলসতা ও উদাসীনতা দেখা দিতে লাগল। হযরত আতেকা (রা.) উৎসাহ দিতেন, কিন্তু তাতে কোনই কাজ হত না।

বিষয়টি যখন জটিল আকার ধারণ করল, তখন হযরত আবুবকর (রা.) বললেন, বেটা , তুমি নারীর ভালবাসায় পড়ে ফরজ আমল থেকে উদাসীন হয়ে পড়েছ। তুমি কর্তব্যের কথা ভুলে গেছ। তুমি কি ঘরে বসে থাকতে পৃথিবীতে এসেছ? এ স্ত্রী তোমার থাকতে পারবে না; একে তুমি তালাক দিয়ে দাও। যার মহব্বত তোমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাকে নিয়ে সংসার করা চলবে না। তুমি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) সমস্যায় পড়ে গেলেন। একদিকে স্ত্রীর ভালবাসা, অন্যদিকে পিতার আদেশ। পিতার অসন্তুষ্টি মানেই আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নারাজী।

সে সময় মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী নিজের ইচ্ছামত নয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছে মোতাবেক চলতেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) যখন দেখলেন, পিতা অসন্তুষ্ট, এর মানে , এরজন্য আল্লাহ্‌র রাসূলও অসন্তুষ্ট। আর আল্লাহ্ রাসূলের অসন্তুষ্টি মানেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।

এ অবস্থায় তিনি বিবিকে তালাক দিয়ে দিলেন। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতে পারলেন না। তিনি অস্থিরচিত্তে দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

একদা তিনি শুয়ে-শুয়ে কবিতা পাঠ করছিলেন :

اَعَاتِكَ قَلْبِیْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . اِلَيْكَ بِمَا تُخْفِی النُّفُوْسُ مُعَلَّقِیْ .

'ওহে আতেকা, সূর্য যতদিন চমকাতে থাকবে, পূর্ব থেকে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যেতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমার হৃদয় তোমার মহব্বতে সিক্ত ও সতেজ থাকবে। একদিন আমি মরে যাব; অথচ কোন দিন তোমার বিরহ-বেদনা ভুলব না।'

হযরত আবুবকর (রা.) পঙক্তিগুলো শুনলেন। তিনি বুঝে নিলেন যে, বিষয়টি তাহলে খুবই জটিল। পুত্রকে বললেন, তুমি আতেকাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো; আমি অনুমতি দিলাম।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) পুনরায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু এবার আর এমন ঘটনা ঘটেনি যে, আবদুর রহমান (রা.) স্ত্রীর প্রেমে মজে কখনও পিছিয়ে রয়েছেন। তায়েফের যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান (রা.) এর বুকে তীর বিদ্ধ হল। সে জখমে ছটফট করতে -করতেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।

ত্রিশ বছর বয়সের যুবতী স্ত্রী।

নিজেও টগটগে যুবক।

চেতনাও তরতাজা।

কিন্তু সমস্ত জযবা-চেতনার উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত জয়ী হয়ে গেল।

হযরত আতেকা (রা.) যখন স্বামীর শাহাদাতের খবর শুনলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে কয়েকটি পঙতি বেরিয়ে এল, যার অর্থ নিম্নরূপ :

'হে আবদুল্লাহ, এখন আর কোন দিন আমার দেহ শান্তি পাবে না। আর কোন দিন আমার শরীরে ভাল কাপড় উঠবে না। যতদিন এ পৃথিবী বহাল থাকবে, যতদিন বুলবুলিরা বাগানে গান গাইবে, ততদিন আমার অন্তরেও তোমার স্মরণ তরতাজা থাকবে।'

আদর্শ পিতার আদর্শ সন্তান

আমাদের গোজরানওয়ালার বড় এক ব্যবসায়ী। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে তাবলীগের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। তার এক ছেলে স্কুলে পড়ত। ছেলেটিকে তিনি স্কুল থেকে বের করে রাইবেন্ড মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমার এক জামাত নিচে পড়ত। সে খুবই সুদর্শন তরুণ ছিল। হাফেজও হয়েছিল। বিশ বছর বয়সে বাবা তাকে শাদী করিয়ে দিলেন। একটি মেয়ে হয়েছিল।

শিক্ষাজীবনের শেষ বছর। তখন এসে তাবলীগে সাল লাগাচ্ছিল মসজিদে তার ও আমার শেষ দেখা হল। আমি জামাতে চলে গেলাম।

ছেলেটি হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। তিন দিন পর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তাঁর মৃত্যু হল। ছেলেটির পিতা এক আজব মানুষ ছিলেন। তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও অশ্রু বের হল না। হাসপাতাল থেকে বের করে ছেলেকে সোজা রাইবেন্ড নিয়ে আসলেন। বললেন, এই নাও তোমাদের আমানত; তোমরাই এর ব্যবস্থা কর।

না বোনদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন।

না ফুফুদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন।

সোজা রাইবেন্ড মাদরাসায় নিয়ে এলেন।

তাকে যখন কবরে নামানো হল, তখন বোন ও ফুফুরা এসে পৌঁছুল। তারা আবেদন জানাল, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাকে আমাদেরকে একটু দেখতে দাও। সান্ত্বনার জন্য তাদেরকে একনজর দেখিয়ে তাকে রাইবেন্ডের কবরস্তানে দাফন করা হল।

আমরা একসাথে থাকতাম। আমার সাথে তার খুবই সখ্যতা ছিল। আমি রাতে যখন তাহাজ্জুদ পড়তে জাগ্রত হতাম, তখন ছেলেটি আমার জন্য চা বানাত। আমাকেও পান করাত, নিজেও পান করত। এমন সুললিত কণ্ঠে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে কুরআন পাঠ করত যে, আমার শুনতেই মন চাইত।

আমি মনে-মনে খুব আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে লাগলাম, আল্লাহ্ যদি তাকে আমাকে স্বপ্নে দেখাতেন, যাতে আমি জানতে পারতাম, আপনি তার সাথে কি-আচরণ করেছেন। আল্লাহ্ আমার মনের আশা পূরণ করলেন। স্বপ্নে তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়ে গেল। ঠিক সে রকম উচু-লম্বা। পরণে সাদা পোশাক। মুখে মুচকি-মিষ্টি হাসি। আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি বললাম, আবদুল্লাহ, তুমি-না মরে গেছ!

বলল, হ্যাঁ।

আমি বললাম, তুমি এখন কেমন আছ?

জবাবে আবদুল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা ইয়াসীনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলো পাঠ করল ঃ

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ـ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ـ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ـ سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ـ

'এদিন বেহেশ্‌তবাসীগণ আনন্দে নিমগ্ন থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে থাকবে তাদের জন্য ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সকল কিছু। সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ।' (৩৬ : ৫৫-৫৮)

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বন্ধু মৃত্যুর সময় তোমার কোন কষ্ট হয়েছিল কি?

বলল, আল্লাহ্‌র শপথ, আমার কোন কষ্টই হয়নি। একজন ফেরেশতা আমার নিকট এসে আমার আঙ্গুলের আগা ধরে নাড়া দিয়ে বলল, আবদুল্লাহ চল, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে নেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি তার সাথে চলে এলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার রূহ কিভাবে বের হয়েছিল?

বলল, এমনিতে বেরিয়ে গেল।

ছেলেটির পিতা জানতেন তার সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তিনি আমার নিকট আসা -যাওয়া করতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, মাওলানা তারেক সাহেব, বলুন আবদুল্লাহ কেমন জীবন যাপন করত?

এমন পিতা যেন আল্লাহ্ তায়ালা সব জায়গায় তৈরি করে দিন।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন- আমার ছেলে কেমন জীবন অতিবাহিত করত?

পরহেযগার ছিল কি-না?

সময় নষ্ট করত কি-না?

এখন কবরে তার আযাব হচ্ছে না তো?

দেখুন, কেমন দরদ কেমন ভাবনা।

ছেলেটির পিতা যখনই রাইবেণ্ড আসতেন, তখনই ছেলের ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করতেন। স্বপ্ন দেখার পর আমি তাকে বললাম, বাবাজি, আপনার জন্য সুখবর আছে। আমি আপনার পুত্রকে স্বপ্নে দেখছি। আমি তাকে স্বপ্নের কাহিনী শোনালাম। বললাম, এবার আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।

কিন্তু এরপরও তিনি পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকলেন একদিন অত্যন্ত উৎফুল্লমুখে আমার কাছে এসে বললেন, মাওলানা সাহেব আমি আমার পুত্রকে স্বপ্নে দেখেছি।

আমি জানতে চাইলাম, তা কেমন দেখলেন?

বললেন, আমি দেখলাম, সে বিছানাপত্র মাথায় করে হাটছে। আমি তার চেহারা দেখছিলাম না, শুধু কোমরটা দেখছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একটি প্রাচীরের নিকট গিয়ে দাঁড়াল এবং ফটক অতিক্রম করে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে প্রাচীরের উপরে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা ছিল– 'রাজিয়াল্লাহু আনহু' (আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট)।

তাম্মাত বিল খায়ের

www.muhammadsaifurbd.wordpress.com

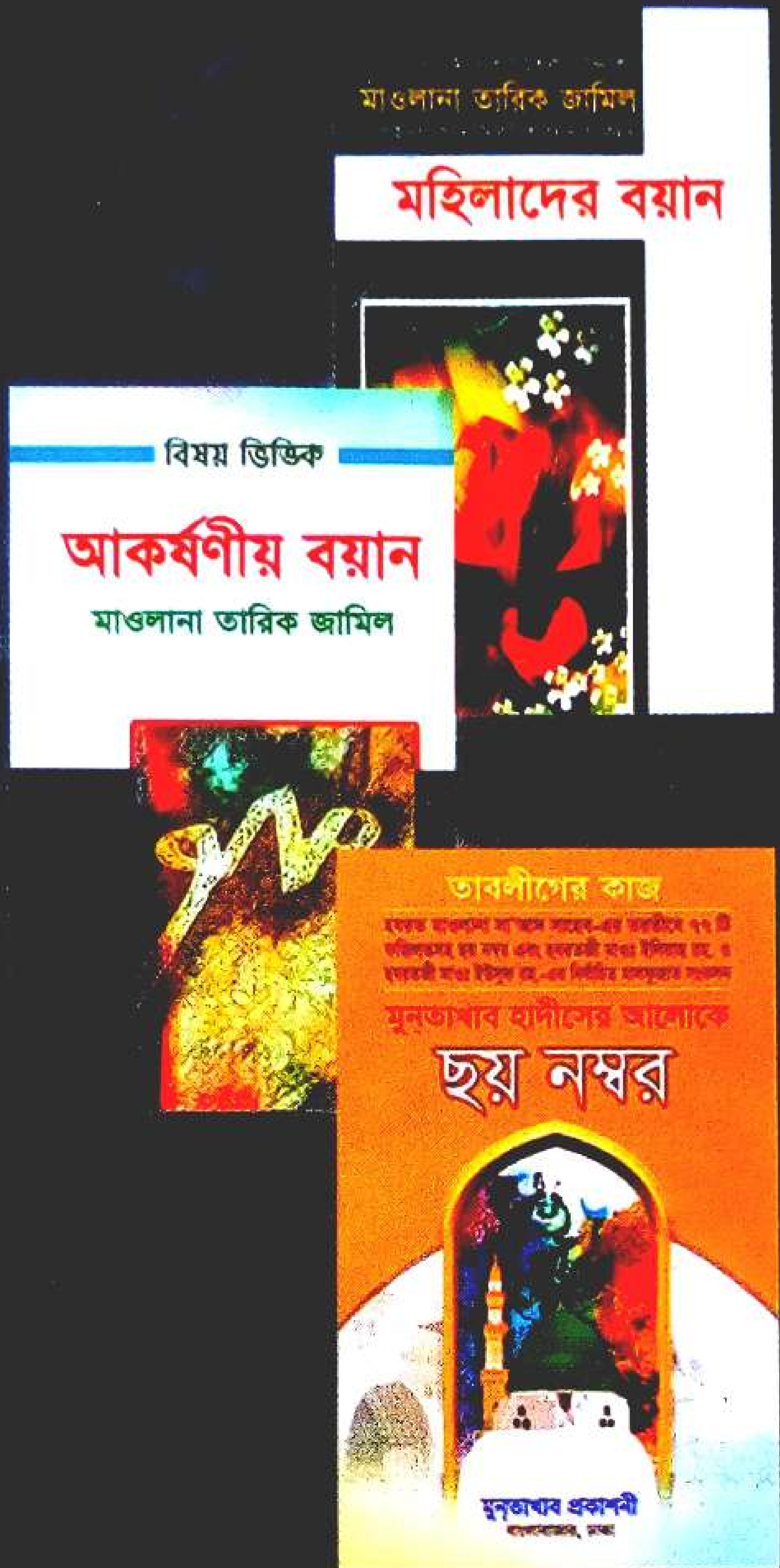

Eman Jagania Kahinee

ঈমান জাগানিয়া কাহিনী

মাওলানা তারিক জামীল

ISBN: 978-984-8947-03-6

মুন্তাখাব প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবা: ০১৭৪৮-৯৭৪৯৫৩; ০১৬৮৭-৬০৯৪৯২

Reshmi Colour Graphics
Cell: 01911568202